Krishi-Granthabali Series No. 12,



শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

[redacted]

মূল্য ।৵০ আনা।

ভূমিকর্ষণ



কৃষিক্ষেত্র, সবজিবাগ, ফলকর, মৃত্তিকাতত্ত্ব, মালঞ্চ

প্রভৃতি রচয়িতা—

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে, F. R. H. S. (Lond.),

Late Superintendent of Gardens, Raj-Durbhanga
Durbhanga, and of the Nizamat State Gardens,
Murshedabad; formerly of the Cossipur
Horticultural Institution, Calcutta, &c.,

প্রণীত।

দে এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

২৭।১, বিডন রো, কলিকাতা।



কলিকাতা

৬ নং ভীম ঘোষের লেন, "গ্রেট ইডিন প্রেসে" শ্রীযুক্ত
এস্, সি, বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩১৯।

 মূল্য ।৵০ [illegible]

ভূমিকা।

বঙ্গভাষায় কৃষিবিষয়ক পঠনীয় পুস্তকের বড়ই অভাব ইহা ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলাম। এজন্য পাশ্চাত্য পুস্তকাদি ও পাশ্চাত্য প্রণালী-পদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়া আমাকে কাজ করিতে হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অভিজ্ঞতা ও গবেষণাপূর্ণ পুস্তকগুলি যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহা বলাই বাহুল্য কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহাদিগের মত বা প্রণালী-পদ্ধতি আমূল অনুসরণ করিতে গেলে অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। গ্রন্থকারের কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল, অনেক দেশ ভ্রমণ করিবার সুবিধা ঘটিয়াছিল, অর্থবল ও লোকবলেরও বিশেষ সুবিধা ছিল, এই সকল সমবেত কারণে তাহার অনেক বিষয় পরীক্ষা করিবার সুযোগ হইয়াছিল। মদীয় যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের লিখিত পুস্তক-পত্রিকা ও পত্র ব্যবহার হইতে উদ্ভূত তাহা আমি অস্বীকার করি না, তবে কার্য্যক্ষেত্রে নানাবিধ কার্য্য করিবার এবং বহুবিধ ব্যাপার পরিদর্শন করিবার সুবিধা থাকায় পাশ্চাত্য মতামতকে সামঞ্জস্য করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলাম। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমি যখন কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হই তখন দেশ মধ্যে কৃষিবিষয়ক একখানিও পঠনীয় পুস্তক ছিল না, পত্রিকা ছিল না। গবর্ণমেণ্ট কৃষিবিভাগও তখন অতিশয় শৈশবাবস্থায় থাকিয়া কৃষিবিষয়ক নানা বিভাগের অনুসন্ধানে রত ছিলেন। পাঠকগণ তদ্দ্বারা বুঝিতে পারিবেন যে আমাকে কত কষ্ট স্বীকার করিতে

হইয়াছে। তাহা ব্যতীত পুস্তকাদি ক্রয় করিতেও বিশেষ বে[illegible] পাইতে হইয়াছিল কারণ বৈজ্ঞানিক পুস্তক সকলের মূল্য ব[illegible] কম নহে।

যাহা হউক, পূর্ব্বে মোটা মোটা বিষয় লইয়া পুস্তক লিখিয়া বাঙ্গলা দেশের যে প্রধান অভাব ছিল তাহার কতকটা মোচন করিয়াছি। অতঃপর পাঠকদিগকে যাহাতে উচ্চ উচ্চ ও সূক্ষ্ম বিষয়ে লইয়া যাইতে পারি তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া 'মৃত্তিকা-তত্ত্ব' প্রচার করি। এক্ষণে 'ভূমি-কর্ষণ' প্রচারিত হইল। জীবনের বাকি কয়টা দিন যাহাতে মাতৃ-ভূমির কার্য্যে নিয়োজিত থাকিতে পারি তাহা[illegible] একান্ত বাসনা। আমাদিগের যে কিছু অভিজ্ঞতা তাহা পৃথিবী[illegible] আসিয়া লাভ করি সুতরাং তাহার উপর কাহারও কিঞ্চি[illegible] ব্যক্তিগত অধিকার নাই, উহা সাধারণের সম্পত্তি, সুতরাং [illegible] পৃথিবীতে রাখিয়া যাইবার চেষ্টা করা প্রত্যেক নর-নারীর কর্ত্তব্য। অভিজ্ঞতা, অর্জ্জিত জ্ঞান। তাহা লইয়া যে পৃথিবী হইতে প্রস্থা[illegible] করে, তাহাকে নীতিশাস্ত্রানুসারে সমাজের নিকট দায়িক করি[illegible] পারা যায়। উক্ত অভিজ্ঞতা রক্ষা করিবার তিনটী উপায় আছে[illegible] ব্যবহারিক কার্য্য, মৌখিক উপদেশ ও পুস্তকাদির প্রচার দ্বা[illegible] লোকশিক্ষার সহায়তা করা। এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ক্রমান্বয়ে 'কৃষি গ্রন্থাবলী' প্রচার করিয়া আসিতেছি এ[illegible] ভগবানের কৃপা থাকিলে উক্ত মহান্ ব্রত হইতে বিচলি[illegible] হইব না।

কলিকাতা,
২০শে, ভাদ্র ১৩১৯ সাল।

গ্রন্থকারস্য।

ভূমি-কর্ষণ।

সূচনা।

কৃষিকথা কহিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে ক্ষেত্র-কৃষির কথা মনে উদয় হয়। ক্ষেত্র-কৃষির প্রধান বিষয়—ভূমিকর্ষণ, কারণ কর্ষণই সকল কৃষির মূল। ভূপৃষ্ঠকে হলপ্রবাহ দ্বারা বিদীর্ণ করিলেই ভূমিকর্ষণ করা হয়, ইহা চিরদিন দেখিয়া ও শুনিয়া আসিতেছি, তথাপি আজ আবার সেই পুরাতন কথার অবতারণা করিতেছি কেন তাহা বলিতেছি।

বাণিজ্য-ব্যবসায় বল, শিল্প-সাহিত্য বল, আর দর্শন-বিজ্ঞানই বল, এ সকলেরই পশ্চাতে ও মূলে কৃষি আছেই। বাণিজ্য-ব্যবসায়, শিল্প-সাহিত্য বা দর্শন-বিজ্ঞান প্রভৃতির অন্তর্গত উচ্চনীচ তাবৎ বিষয়কে এক সূত্রে মাল্যাকারে গ্রথিত করিলে দেখিতে পাই যে, কৃষিও তাহার কোনও স্থানে স্থান পাইয়াছে। আবার যদি একখণ্ড দীর্ঘ সূত্রে তৎসমুদায়কে আবদ্ধ করা যায় তাহা হইলে আরও সহজে দেখিতে পাই যে, সর্ব্বনিম্নে মূলরূপে কৃষিই স্থান পায়। উক্ত নিম্নস্থানকে মূলই বলিতে হইবে, কারণ উহারই উপর অপরাপর দর্শন, বাণিজ্য-ব্যবসায় প্রভৃতি সাংসারিক তাবৎ ব্যাপার অবস্থিত। সমাজের ভিত্তি, রাজনীতির ভিত্তি, অধিক কি, ধর্ম্মনীতিও কৃষির উপর দণ্ডায়মান।

কৃষি ছাড়িয়া দিলে কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। কৃষিজাত দ্রব্য—কাঁচামাল হউক বা রূপান্তরিত হউক—বণিকের পণ্যসম্ভার, শিল্পীর শিল্পোপকরণ; কৃষিজাত দ্রব্যে গৃহস্থের খাদ্যপরিধেয়ের উৎপত্তি, বিলাসীর আরাম-ঐশ্বর্য্যের উপাদান। কোন্ বিষয়ে কৃষির সম্বন্ধ নাই? কৃষিজাত দ্রব্য গাভীর উদরপূরণ করে, তদ্বিনিময়ে গাভী দুগ্ধ প্রদান করিয়া শিশুর পেট ভরায়, শরীর-মনকে পরিপুষ্ট করে। কত নাম করিব? নিবিষ্টচিত্তে যতই ভাবিয়া দেখা যায় ততই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, কৃষি ভিন্ন কোন উপায় নাই। কৃষিই ধনাগমের প্রধান উপায়। এই জন্য কৃষির কথা সর্ব্বাগ্রে আলোচ্য, কৃষির উন্নতিসাধন সর্ব্বাগ্রে অবশ্য কর্ত্তব্য। দেশের অবস্থার বিষয় পরিচয় দিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে কৃষকদিগের অবস্থার পরিচয় দিতে হয়। যে দেশের কৃষক অন্নক্লিষ্ট, দুস্থ ও দুর্ব্বল সে দেশকে কোন মতে সুসভ্য বা সমুন্নত বলিতে পারা যায় না। কৃষককুল যখন শিক্ষিত, সম্পন্ন, স্বাস্থ্যবান ও সদা প্রফুল্লানন হইবে, তখনই দেশকে সুসভ্য, উন্নত, ধনী বলিতে পারিব। কিন্তু এ সকলেরই মূল অন্ন—বহু অন্ন। বহু অন্ন না হইলে ধর্ম্মকার্য্যও সহজ হয় না, অধিবাসীগণের প্রবৃত্তি উচ্চ হয় না, নৈতিক বিকাশ হয় না, উপরন্তু দেশমধ্যে কুনীতি পরায়ণ ব্যক্তির যেমন প্রাধান্য হয়, সেইরূপ দস্যু তস্কর জালিয়াৎ জুয়াচোর প্রভৃতি সমাজদ্রোহী ও ধর্ম্মনাশার দলে দেশ ভরিয়া যায়। এই জন্য কৃষককুলই জনসমাজের মেরুদণ্ড, ইহারাই দেশের বাণিজ্য ব্যবসায়ের ভিত্তিসংস্থাপক, অদৃষ্টপরিচালক, ধনাগমের পথনির্ণায়ক। জনসমাজের উচ্চস্তরসমূহ যাবতীয় সুখ-সম্পদ ঐশ্বর্য্য-বিলাস উপভোগ করিলেও সুদূরগ্রামস্থ দরিদ্র

কুটীরবাসী কৃষককুলই তাহার মূল। দুর্দ্দিন ও দুর্ব্বৎসরে সর্ব্ব প্রথমে এই কৃষককুলই দুর্দ্দশাগ্রস্থ হয়। তাহা বলিয়া অপর সকলে যে পূর্ব্ববং সুখে ও আরামে থাকিবেন তাহার যো-টী নাই, কারণ সেই দুর্ব্বৎসরের প্রবল বেগ সকলকেই অল্লাধিক অনুভব করিতে হয়, বাণিজ্য ব্যবসায় শিল্পকারখানা প্রভৃতি তাবৎ বিষয়েই ইহার ঘাত প্রতিঘাত হইতে পারে।

বিগত দশ কি পনর বৎসরের মধ্যে দেশের আর্থিক অবস্থা কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকল দ্রব্য,—ক্ষেত্রজাত শস্য, শিল্পজাত পণ্যনিচয়,—মহার্ঘ হইয়াছে, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সাংসারিক কষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে, না হয়, সুখ সমৃদ্ধি ও স্বচ্ছলতার মাত্রা হ্রাস পাইয়াছে। এইরূপ সকলদিকেই বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। এ সকলেরই মূল কৃষির হীনাবস্থা। বড় বেশীদিনের কথা নহে—মাত্র ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে—চাউলাদি নিত্যব্যবহার্য্য সামগ্রীর মূল্য যাহা ছিল, এক্ষণে তৎ-সমুদায়ের মূল্য দ্বিগুণ কিম্বা তাহারও অধিক হইয়াছে, সুখ স্বচ্ছন্দও আরামের জন্য অনেক নূতন নূতন সামগ্রী ও উপায় দ্বারস্থ হওয়ায় লোকের অভাবের মাত্রাও সমধিক বাড়িয়া গিয়াছে। এ বেগ রুদ্ধ হইবার নহে। কালের স্রোত, কালের তরঙ্গ, কালের প্রবাহ, দিন দিন খরতর বেগে বহিতে থাকিবে সুতরাং তৎসমুদায়কে উপেক্ষা করিতে পারা যাইবে না। কালের স্রোত সঙ্গে সকলকেই চলিতে হইবে—ইহাই জগতের নিয়ম, কাল কাহারও জন্য কোন কালে অপেক্ষা করে নাই এবং করিবেও না। এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল বলিয়া আজ তুর্কী লাঞ্ছিত ও প্রপীড়িত, পারস্য গতাশুপ্রায়। সুবিশাল চীনসাম্রাজ্য পর

গ্রাসে যাইবার পথে পড়িয়াছিল কিন্তু তাহার চক্ষুরুন্মীলিত হওয়ায় বাঁচিয়া গেল। মোট কথা, সংসারে যোগ্যেরই স্থান আছে, অযোগ্যের স্থান নাই, সেইজন্য ডারউইন্ সাহেব বলিয়াছেন— 'Survival of the fittest.'

রাজনীতিক পরাধীনতায় তত কিছু আসিয়া যায় না। রাজনীতিকে ধনী ও সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের অন্যতম বিভব বা Luxury বলিয়া মনে করিলে নিতান্ত অন্যায় হয় না। উদর পূর্ণ থাকিলে উক্ত বিভব অতি উপাদেয়, অতি মুখরোচক, কিন্তু দেশের আভ্যন্তরিক ও আর্থিক অবস্থা পরমুখাপেক্ষী হইলে সে দেশের রাজনীতি কি? সে দেশের উন্নতির আশা বা কোথায়? দেশের আভ্যন্তরিক—সামাজিক, সাংসারিক, গৃহস্থালী—বিষয়ের উন্নতিসাধন করিতে হইলে গরীব ভারতবাসীদিগকে সর্ব্বাগ্রে কৃষিবিষয়ে মনোনিবেশ করতঃ দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে হইবে।

কৃষির উন্নতির একমাত্র উপায় দেশকে কৃষিপ্রধান করা, কিন্তু তাহা করিতে হইলে ক্ষেত্রের উৎপাদিকাশক্তিকে উদ্দীপিত করিয়া মৃত্তিকার প্রত্যেক কণাকে, প্রত্যেক অনু-পরমাণুকে শক্তিশালী ও কার্য্যকরী করিতে হইবে। এই একই উক্তি বারম্বার বলিয়া অসিতেছি, আবার আজও তাহার পুনরুল্লেখ করিতেছি যে, ভূমি হইতে পূর্ণমাত্রায় ফসল উৎপন্ন করিতে হইবে, ভূগর্ভস্থ তাবৎশক্তিকে খাটাইয়া লইতে হইবে, শস্যশ্যামলা ভারতভূমিকে পুনরায় ধন-ধান্যে পূর্ণ করিতে হইবে, ভারতের অকাল-মৃত্যুর স্রোত রোধ করিতে হইবে, দেশে পুনরায় স্বাস্থ্য ও প্রফুল্ল আনন আনয়ন করিতে হইবে।

কর্ষণ।

পৃথিবীর উৎপাদিকাশক্তিকে জাগরিত ও বর্দ্ধিত করিতে হইলে প্রথম ও প্রধান কার্য্য—ভূমিকর্ষণ। কৃষির সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্ব প্রধান কার্য্য—ভূমি বিদারণ। যখন কৃষিকার্য্যোপযোগী কোন যন্ত্রের বা কোন উপকরণের সৃষ্টি হয় নাই, তখন রীতিমত চাস-আবাদ করিবার উপযোগী কোন উপায় বা প্রণালী-পদ্ধতিরও উদ্ভব হয় নাই। সেই ঘোর তমসাচ্ছন্ন অবস্থায় কাষ্ঠ বা প্রস্তর ফলক দ্বারা লোকে ভূমির স্থানে স্থানে ঈষৎ গর্ত্ত করিয়া বীজ পুতিয়া দিত। ইহাই কৃষিকার্য্যের সূচনা। ক্রমে ক্রমে আদিমগণ কৃষির মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল, ফলতঃ কৃষির উন্নতি হইতে লাগিল। শারিরীক পরিশ্রমবহুল কার্য্য বলিয়া কৃষিকার্য্য নিম্ন-শ্রেণীর নিরক্ষর কষ্টসহ ব্যক্তিগণ কৃষিকার্য্য করিয়া আসিতেছে। ভদ্রলোকে কখনও কৃষিকার্য্য করিয়াছে কিনা, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। আমাদিগের তাবৎ কৃষি সেই নিরক্ষর অবস্থাহীন কৃষকদিগের হস্তে সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত। শিক্ষিতব্যক্তিগণ কখনও কৃষিকার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই বলিয়া আজ আমাদিগের কৃষির এই দুরবস্থা। এ দেশে আজ পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই যে, ভূমিকর্ষণের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, মৃত্তিকার উৎপাদিকাশক্তিকে বর্দ্ধিত করিতে পারা যায় কি না? দেড়শত বৎসরের অধিক হইল আমরা ইংরাজের আমলে

আসিয়াছি এবং সেই অবধি পাশ্চাত্য জগতের সহিত আমাদিগের ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইয়াছে। তদবধি আমরা ইয়ুরোপের অনেক চাল-চলন গ্রহণ করিয়াছি, বলিতে কি, প্রায় প্রত্যেক ভারতবাসী মধ্যে উক্ত চাল-চলন, আচরণ-পদ্ধতি কোন-না-কোনরূপে প্রবেশ-লাভ করিয়াছে কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, কৃষিবিষয়ক কোন সংস্কার কেহ প্রবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। ইয়ুরোপ ও আমেরিক-যুক্তরাজ্যে সামান্য সামান্য উপায় অবলম্বন দ্বারা কৃষিকার্য্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। তথাকার কৃষিকার্য্যের প্রধান লক্ষ্য—গভীর কর্ষণ। এতদুপলক্ষে কিছুদিন পূর্ব্বে হলচালিত হইত—অশ্বদ্বারা; পরে হইল—বাষ্পীয় যন্ত্রসহযোগে; কিন্তু তাহাতেও যুক্তরাজ্যবাসীদিগের তৃপ্তি না হওয়ায় 'ডিনামাইট্' অর্থাৎ বোমা সহযোগে ক্ষেত্র কর্ষণ হইতেছে! এতদ্দ্বারা ভূগর্ভের ৫।৬ ফুট মৃত্তিকাকে আবাদ উপযোগী করিয়া লওয়া হইতেছে। জানি না অদূর ভবিষ্যতে আরও কি নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইবে।

যাহা হউক, কৃষকগণ ত কর্ষণ করিয়াই থাকে, তবে আবার বিশেষ করিয়া, নূতন করিয়া, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবার তাৎপর্য্য কি? আমরা এক্ষণে নূতনভাবে নবোদ্যমে কার্য্য করিতে চাহি। শিক্ষিত ভদ্রলোকে অল্পে অল্পে যখন কৃষির দিকে অগ্রসর হইতেছেন তখন তাঁহাকে প্রাচীন মতে কার্য্য করিলে চলিবে না, কারণ তাহাতে তিনি কিছুতেই সুরাহা দেখিতে পাইবেন না, বরং এতই ক্ষতিগ্রস্থ হইবেন যে, তাহা হইতে উদ্ধার পাওয়া অনেক সময় অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

কর্ষণের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি?—প্রধানতঃ পাঁচটী বিশিষ্ট উদ্দেশ্যে ভূমি কর্ষিত হইয়া থাকে (১) মৃত্তিকা চূর্ণন,

(২) কর্ষিত মৃত্তিকায় রস সংরক্ষণ, (৩) ভূগর্ভস্থ পদার্থ সমূহকে উদ্ভিদের আহরণোপযোগী করণ, (৪) ক্ষেত্রস্থ আগাছা নিবারণ, (৫) আর্দ্র ভূমিকে শুষ্ক করণ। কর্ষণদ্বারা উল্লিখিত পাঁচটী কার্য্য ছাড়া আরও কতকগুলি কার্য্য সুসিদ্ধ হইয়া থাকে, প্রসঙ্গ-ক্রমে তাহাদিগের যথাস্থানে উল্লেখ করিব। নিরক্ষর কৃষক এত হিসাব রাখে না, এত কথা জানে না, কিন্তু প্রাচীন ও পূর্ব্ব পুরুষদিগের অনুসৃত প্রথানুসারে হলচালনাদি দ্বারা জমিকে আবা-দোপযোগী করিয়া লয়। কৃষক, সকল কার্য্যই করে কিন্তু কিসে কি হয় তাহা অবগত নহে বলিয়া, নির্দ্দিষ্ট প্রাচীন প্রথা হইতে এক পদ অন্যদিকে যাইতে ভরসা করে না। চিরকাল যে প্রণালীতে ক্ষেত্র কর্ষিত হইয়া আসিতেছে তাহা এক্ষণকার সময়োপযোগী কি না, তাহার আলোচনা করা উচিত। এ দেশে যে লাঙ্গলের ব্যবহার হইয়া আসিতেছে তাহা যেমন লঘু, তেমনি ক্ষীণফলক, তন্নিবন্ধন ভূগর্ভমধ্যে ফালের ঈষৎ অধিক প্রবিষ্ট হয় না, মাত্র ভূপৃষ্ঠের নিম্নস্থ ৪।৫ অঙ্গুলির অধিক মাটি বিচলিত হয় না, কিন্তু গভীর চাষ না হইলে আর চলে না। উক্ত ক্ষীণ স্তর ৩।৪ বা ৫ অঙ্গুলি মাটি বহুকাল হইতে কর্ষিত হইয়া আসিতেছে, তন্নিবন্ধন তাহা নিঃস্ব হইতে নিঃস্বতম অবস্থায় পরিণত হইয়াছে, তথাপি বলিতে হয় যে, দেশের ভাগ্যবলে এখনও তাহাতে ফসল উৎপন্ন হইতেছে, কিন্তু যাহা হইতেছে তাহা চাষ-আবাদের গুণে নহে,—প্রাকৃতিক ও নৈমিত্তিক কারণে।

প্রাকৃতিক কারণ।—ইহার মধ্যে রৌদ্র, বৃষ্টি, বায়ু ও শিশির গণ্য। ভূমি কর্ষিত হইলেই উল্লিখিত পদার্থসমূহ মৃত্তিকা মধ্যে প্রবেশ লাভ করে, ফলতঃ মৃত্তিকা মধ্যে একটী ভৌতিক ক্রিয়ার

সমাবেশ হয়, কিন্তু উক্ত ক্রিয়া বা তজ্জাত শক্তি দীর্ঘকালস্থায়ী না হইয়া সম্মুখস্থ ভাবী ফসলদ্বারা তাহা ত পরিশোষিত হয়ই, উপরন্তু মৃত্তিকান্তর্গত জৈবাজৈব নির্ব্বিশেষে বহু পদার্থ—ফসল স্থানান্তরের সহিত—ক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইয়া যায়। অকর্ষিত দৃঢ়-পৃষ্ঠ ভূমিতে বায়ব্বাদি প্রবেশ করিতে পারে না তন্নিবন্ধন ভূগর্ভ প্রাকৃতিক সাহায্য হইতে বঞ্চিত থাকে। ভূগর্ভের সহিত উহাদিগের সংসর্গ ঘটিলে ভূগর্ভস্থ মৃত্তিকা দুই প্রকারে লাভবান হয়, ১ম—উহাদিগের সঞ্চার হেতু যবক্ষার-জান (Nitrogen) ও আঙ্গারিক অম্ল (Carbon dioxide) * দ্বারা ভূগর্ভ সারবান হয়; ২য়—মাটিতে যে সকল অজীর্ণ জৈব বা অজৈব পদার্থ থাকে তাহারাও বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে, তাহাদিগের ঘনতা ভাঙ্গিয়া যায়। অতঃপর উল্লিখিত বায়ুসন্নিহিত পদার্থ ও মৃত্তিকান্তর্গত বিশ্লিষ্ট পদার্থের একত্র সমাবেশ ফলে মৃত্তিকার গুণ বৃদ্ধি হয়, মৃত্তিকার প্রত্যেক পরমাণু শক্তিশালী হয়। অতঃপর কোটী কোটী পরমাণুর শক্তি ও ভৌতিক ক্রিয়ার অনর্গল প্রবাহের পরস্পর সম্মিলন ফলে ভূগর্ভ মধ্যে যে অদ্ভুত ক্রিয়ার আবির্ভাব হয়, তাহাই ভূমির উর্ব্বরতা। এইখানেই যে, সকল কার্য্য শেষ হইল তাহা নহে। এক্ষণে উহাতে শক্তি সঞ্চারিত না হইলে, মাত্র উর্ব্বরতা দ্বারা কোন ফল হয় না। উক্ত শক্তির মূল—আলোক। আলোক ব্যতীত সে শক্তির উদ্ভব হয় না। উক্ত শক্তির নাম—Energy বা উদ্যম।

* পাথুরে কয়লা পোড়াইলে কিম্বা ঘুটিং (Lime Stone) পাথর উত্তপ্ত করিলে যে ধূম বা বাষ্প (Gas) উদ্গত হয় তাহাই কার্ব্বন ডায়োক্সাইড (Carbon dioxide)। উক্ত বাষ্প বায়ুমণ্ডলে শতকরা ০,০৩ ভাগ থাকে। (Soda Water) প্রস্তুত করিতে এই গ্যাসের প্রয়োজন হয়।

আলোক ও উদ্যম।—উক্ত উদ্যমের অত্যাবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, দিবাভাগে ভূগর্ভে যত কার্য্য তৎপরতা দেখা যায় রাত্রিকালে তত বা আদৌ দেখা যায় না। উদ্ভিদের দেহেও দিবাভাগে যে কার্য্য হয় রাত্রিকালে তাহা হয় না। এতদ্দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, রাত্রিকালে জীব-জগত যেরূপ বিশ্রাম করে ও নিদ্রা যায়, ধরিত্রীও সেইরূপ রাত্রিকালে নিদ্রাগত হয়, তখন ভূগর্ভ-কারখানার কার্য্য আপাততঃ স্থগিত থাকে। পাশ্চাত্য কৃষি ইহাতেও সন্তুষ্ট নহে, এজন্য মৃত্তিকাকে রাত্রি-কালেও সমভাবে ক্রিয়াশীল রাখিবার জন্য ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক আলোক এবং ভূগর্ভে বৈদ্যুতিক তার প্রসারিত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। স্বাভাবিক নিয়মে উদ্ভিদগণ রাত্রিকালে বর্দ্ধিত হয় না কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বৈদ্যুতিক আলোক ও বিজলী-প্রবাহ (Electric Current) প্রয়োগ দ্বারা রাত্রিকালেও উহাদিগের বিবর্দ্ধিনী শক্তিকে জাগরিত রাখিতে পারা যায়। এতদ্দ্বারা উদ্ভিদগণ দিবারাত্রি নির্ব্বিশেষে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তন্নিবন্ধন উদ্ভিদগণের বৃদ্ধি এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থগিত থাকিবে না। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল কি? অবিচ্ছিন্ন বৃদ্ধি হেতু ফসলের তাবৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বহু অগ্রে ও বহুগুণ পরিপুষ্ট হয় এবং শীঘ্র ফলবতী হয়। আলোক প্রভাবে যে কেন বৃদ্ধি হয় তাহা বলিতেছি। আলোকের অবিচ্ছেদ হেতু ভূগর্ভস্থ উদ্ভিদ-খাদ্য নিরন্তর বিশ্লেষিত হইয়া সদ্য আহরণোপযোগী অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, এক মুহূর্ত্তের জন্য উদ্ভিদগণ আহারাভাব বোধ করিতেছে না কিম্বা আহার্য্য পদার্থ আহরণোপ-যোগী অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই বলিয়া তাহাদিগকে অপেক্ষা করিতে,

কিম্বা শ্রম স্বীকার করিয়া দূরস্থানে ধাবিত হইতে, হইতেছে না। লণ্ডন সহরের উইলিয়ম সাইমেন্‌স্ (William Siemens) হেলসিংফরসের লেম্‌ষ্ট্রোয়েম (K. S. Lenistroem) ও থোয়েটস্ (B. T. Thwaites) সাহেব উল্লিখিত প্রণালীতে পরীক্ষার প্রথম সূত্রপাত করেন। থোয়েট সাহেব নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন করেন যে, মাটির ভিতর দিয়া বিজলী প্রবাহ পরিচালিত করিতে পারিলে উদ্ভিদের পরিমাণ, বৃদ্ধি ও গুণবত্তা সমূহরূপে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। লেমষ্ট্রোয়েম সাহেবের পরীক্ষা ফলে প্রকাশ যে, ১০—অশ্ব শক্তিশালী (10-horse Power) ইঞ্জিন সহযোগে ২০০০ একর (কিঞ্চিদধিক ছয় হাজার বিঘা) ভূমিতে বৈদ্যুতিক কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। সুইডেন রাজ্যের অন্তঃবর্ত্তী আটভিদাবর্গ (Atvidaberg) নামক স্থানে উক্ত বৈদ্যুতিক প্রণালীতে আবাদ করিয়া যথেষ্ট সুফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বিগত খৃষ্টীয় ১৯০২ সালে প্রিংসিম (Pringshiem) নামক জর্ম্মান বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ভূমিতে বৈদ্যুতিক প্রবাহ দ্বারা বহুগুণ ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। তৎপ্রদত্ত বৃদ্ধির তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :—

খৃঃ ১৯০২ সাল।

বার্লি (যব) খড় ও শস্য	...	৩২	ভাগ	শতকরা।
ওট (জৈ) ঐ	...	৪৩	,,	,,
আলু ...	...	২৪	,,	,,
ষ্ট্রবেরী ...	...	৫০	,,	,,

খৃঃ ১৯০৩ সাল।

ষ্ট্রবেরী	...	...	১২৩	,,	,,
যব	...	...	৩২.৫	,,	,,
মিঠাবীট (Sugar Beet)		...	১১৯.৫	,,	,,
বীন (Bean)	...	...	৩০	,,	,,

উপরের তালিকা হইতে জানা যায় যে, বৈদ্যুতিক শক্তি সংযোজনা দ্বারা কোন্ কোন্ ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি কিরূপ হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, বৈদ্যুতিক শক্তি সংযোগে ফসলের গুণবত্তাও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে নিম্নস্থ তালিকা দৃষ্টে তাহা বুঝা যায়।

বীট (শর্করা বৃদ্ধি)	...	২.২	হইতে	২.৭	ভাগ
রাই (প্রোটীম বৃদ্ধি)	...	১৯	,,	,,	,,
ঐ (নাইট্রোজেন বৃদ্ধি)	...	১৯.২	,,	,,	,,
ঐ (আল্‌বুমেন বৃদ্ধি)	...	১৪.৩	,,	,,	,,*

উপরে যাহা লিখিত হইল তদ্দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, সকল উদ্ভিদের জন্য আলোক বিশেষ প্রয়োজন। সাধরণতঃ লোকের ধারণা উদ্ভিদের দেহভাগ পরিপুষ্টির জন্য আলোকের প্রয়োজন, ভূগর্ভে আলোকের কোন প্রয়োজন হয় না, কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে আমরা প্রদর্শন করিয়াছি যে, উর্ব্বরতা বিধায়ক তাবৎ পদার্থ মাটির মধ্যে থাকিলেও কার্য্যকরী শক্তি বা উদ্যম (Energy) না থাকিলে কোন কাজই হয় না। মৃত্তিকার জীবনই—তাহার উদ্যম বা ক্রিয়া-শক্তি এবং সেই শক্তির মূল—আলোক।

বায়ু।—মৃত্তিকার মধ্যে রস থাকা যেরূপ প্রয়োজন তন্মধ্যে

* Oskar Nagel in Cassel's Magazine.

বাতাস থাকাও তদনুরূপ প্রয়োজন। বলা বাহুল্য যে, রস ও বাতাস সমভাবেই প্রয়োজন। একের অভাব থাকিলে অন্যের দ্বারা কোন কাজ হয় না। মৃত্তি মধ্যে জল যেরূপ মহামূল্যবান ও অবশ্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী, বায়ুও সেইরূপ, কিন্তু মৃত্তিকার সহিত ইহার কত ঘন সম্পর্ক তাহা কয় জন ভাবিয়া দেখেন? ভূগর্ভ মধ্যে যতদূর ও যত প্রয়োজনমত বায়ু বিদ্যমান থাকে ততদূরের মৃত্তিকা সেই মত সজীব ও ক্রিয়াশীল থাকে। ভূগর্ভ মধ্যে কোথায় ও কিরূপে বাতাস থাকে সংক্ষেপে তাহার অনুশীলন করিব।

প্রথমতঃ দেখা যায়, মৃত্তিকার পরমাণুগণের সমাবেশ ফলে স্বতঃই ছিদ্রপথ (Capillary tube) উৎপন্ন হয়। উক্ত ছিদ্র-পথ সমূহ পরস্পর সংযোজনা হেতু বহুদূর বিস্তৃত ও জালবৎ হইয়া থাকে। এই ছিদ্র সমূহই বায়ু, রস, উত্তাপ প্রভৃতির স্থান। ভূগর্ভে বায়ুর স্থান আছে কিনা, তাহাতে বায়ু আছে কিনা ইহা পরীক্ষা করা অতি সহজ এবং প্রতিনিয়ত তাহা হইতেছে, কিন্তু লক্ষ্য করি না বলিয়া তাহা আমাদের খবরে আসেনা। খানিকটা জল ভূমিতে ঢালিয়া দিলেই তাহা শোষিত হইয়া যায়। উক্ত জল পৃথিবী শোষণ করিয়া লয়। ভূগর্ভস্থ ছিদ্র মধ্যে বায়ু বিদ্যমান থাকে, এই জন্য তন্মধ্যে জল প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়, কিন্তু ছিদ্রপথগণ জলপূর্ণ থাকিলে বাহিরের জল কখনই ভিতরে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় না। শূন্য কলসীকে জলপূর্ণ করিতে পারা যায়, কিন্তু জলপূর্ণ পাত্রে আদৌ জল ধরেনা। ভূগর্ভে বায়ুর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আর একটী উদাহরণ দিতেছি। ক্ষেত্র মধ্যে কোন স্থল যৎসামান্য নাবাল থাকিলে, দেখা যায়, তদুপরিস্থ গাছগুলি অপরাপর গাছ অপেক্ষা ঘনবর্ণ, তেজাল ও বড়, কিন্তু বর্ষাতে সেই নাবাল স্থানটী

জলপূর্ণ হইয়া গেলে উক্ত জল শোষিত হইয়া শুকাইতে ২।৪ দিন সময় লাগে। কয়েক দিন এইরূপে জল সঞ্চিত থাকিবার পরে শুষ্ক হইয়া গেলে গাছগুলির আর পূর্ব্ববৎ ঘণ বর্ণ বা তেজ থাকে না, বরং ক্রমশঃ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করতঃ শ্রীহীন হইয়া পড়ে, অবশেষে মরিয়া যায়। এরূপ হইবার কারণ এই যে, জলের ভারে স্থানীয় ভূগর্ভস্থ বায়ু তথা হইতে বহির্গত হইয়া যায়, মাটী জলময় হয়, ভূপৃষ্ঠের ঘন সরদ্বারা ছিদ্রপথের মুখসমূহ রুদ্ধ হইয়া যায়, অবশেষে সেই সর শুকাইয়া কঠিন হইয়া যায়। তখন আর উদ্ভিদের মূলগণের সহিত বায়ুর কোন সম্পর্ক থাকে না। আবার সেই সর ভাঙ্গিয়া মাটী চূর্ণ করিবা দিলে সেই সকল নির্জীব ও মৃতপ্রায় উদ্ভিদগণ পুনরায় ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতে থাকে।

অতঃপর দেখা যায় যে, বায়ু নির্গুণ পদার্থ নহে। কয়েকটী পদার্থের সম্মিলনে বায়ুর উৎপত্তি। তাহা ব্যতীত বায়ুমণ্ডলে গিয়া যাহা কিছু স্থান পায় তাহাকেই উহা আগ্রহ সহকারে আপনার সহিত একাঙ্গীভূত করিয়া লয়। ভূগর্ভ যেরূপ উদ্ভিদের আহার্য্য পদার্থে পূর্ণ, বায়ুমণ্ডলও সেইরূপ উদ্ভিদের আহরণোপযোগী বাষ্পীয় পদার্থে পূর্ণ। ডাক্তার ভোয়েল্কার বলিয়াছেন যে, ভারতীয় মৃত্তিকা এতই নিঃস্ব হইয়া গিয়াছে যে, তাহাতে সার সংযোজিত না করিলে আর চলে না। এই উক্তি শুনিয়া এ দেশের বহু লোক শিহরিয়া উঠিয়াছেন এবং আতঙ্কে হৈ চৈ করিতেছেন। আবার বিলাতের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক সার উইলিয়াম ক্রুকস্ (Sir William Crookes) হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, আর ৪০।৫০ বৎসর পরে নাইট্রোজেন আর থাকিবে না। ইহাতে লোকের ভয় পূর্ণমাত্রায় চড়িয়াছে। মহা-মহারথীগণ যখন এরূপ

কথা প্রচার করিতেছেন তখন আমরা কোন ছার? তবে আমরা ইহা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, অকিঞ্চিৎকর হইলেও আমারা সহজবুদ্ধিবিহীন নহি, এবং সহজ-বুদ্ধিতে যাহা দেখিতে পাই ও যাহা বুঝিতে পারি তাহাতে ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত যে, পৃথিবীর কথা ছাড়িয়া দিই, ভারতবাসীকে সে জন্ত উদ্বিগ্ন হইবার প্রয়োজন নাই। ধরিত্রীগর্ভ রত্নে পূর্ণ, বেদেরকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত চাষ-আবাদ করিয়াও তাহার কোন ক্ষতি হয় নাই, যদি তাহা হইত, তাহা হইলে বহুদিন পূর্ব্বে সৃষ্টি বিলুপ্ত হইত। বায়ু-মণ্ডল সম্বন্ধেও সেই কথা। বায়ুমণ্ডলও নাইট্রোজেন বাষ্পে পরিপূর্ণ। বায়ুমণ্ডলেরও সেই অক্ষয়-ভাণ্ডার কোন কালে ক্ষয় হইবার নহে। বরং লেইবিগ (Baron Von Leibig) সাহেব যাহা বলিয়াছেন—তাহাকে আমরা শিরোধার্য্য করিতে পারি। লেইবিগ সাহেব বলিয়াছেন যে, নাইট্রোজেনের জন্ত ভাবিত হইতে হইবে না, ভূমির অজৈব (Inorganic) পদার্থ যাহাতে না ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখ। তাহার অর্থ এই যে, প্রতিবার আবাদে ফসলের সহিত যে সকল ও যত অজৈব পদার্থ বহির্গত হইয়া যাইতেছে পুনরায় তাহাই ক্ষেত্রে প্রদান কর, বায়ুমণ্ডল নাইট্রোজেন প্রদান করিবে। লেইবিগ্ সাহেবের কথাটী বড়ই যুক্তিপূর্ণ। কিন্তু যত দিন যাইতেছে, তত নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে, তত নূতন মত প্রচারিত হইতেছে। এক্ষণে ক্যাম্বেল সাহেব আসর গ্রহণ করিয়া আবার এক নূতন কথা প্রচার করিতেছেন, এবং বলিতে-ছেন যে রত্নগর্ভা ভূগর্ভকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করা হয় নাই, উহা রত্নভরা, উহার ভাণ্ডার শেষ হইবার নহে। তাঁর মূলমন্ত্র গভীর কর্ষণ ও সুকর্ষণ। আমরা দুই চারি ইঞ্চ, না হয় এক

ফুট, কর্ষণ করিয়াছি। যদি তাহা নিঃস্ব হইয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে আরও ভিতরের স্তরকে বিচলিত কর, এখনও বহুকাল চলিবে। যে দেশের স্বাভাবিক বারিপাতের অনুপাত অনধিক, কিম্বা যে বৎসর স্থানীয় পূর্ণমাত্রা অপেক্ষা অল্প বারিপাত হয়, সে দেশে কিম্বা সে বৎসর উক্ত উপায় অবলম্বন দ্বারা আশানুরূপ ফসল উৎপন্ন করিতে পারা যায়।

ঘনভাবে উদ্ভিদ রোপিত হইলে স্থানাভাবে উদ্ভিদগণ চারিদিকে প্রসারিত হইতে না পারিয়া ঊর্দ্ধদিকে লম্বমান হয়, তাহাতে বহু শাখা-প্রশাখা ও বহু পত্র জন্মে না, তন্নিবন্ধন উদ্ভিদগণ বায়ুমণ্ডল হইতে যথেষ্ট পরিমাণে বাষ্পীয়পদার্থ আহরণ করিতে সমর্থ হয় না। এই জন্য প্রত্যেক উদ্ভিদকে প্রকৃত পরিমাণে স্থান দিতে হয়। উদ্ভিদ-অবয়বের তাবৎ হরিদংশ দ্বারা বায়ুমণ্ডলস্থ বাষ্পীয় পদার্থ আহরিত হয়। উদ্ভিদাংশের ন্যায় ভূগর্ভ মধ্যে মূলগণ অবাধে প্রসারিত হইতে না পাইলে মূলের সংখ্যা বাড়ে না, মূল তেজাল হয় না, তাহা ব্যতীত মূলগণ পরস্পরে বিজড়িত হইয়া পরস্পরের বৃদ্ধি ও কার্য্যক্ষমতার প্রতিবন্ধক হয়। গভীর কর্ষণ ও মৃত্তিকা উত্তমরূপে চূর্ণ হইলে মূলগণ অবাধে চারিদিকে ধাবিত হইতে পারে, মূলের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় সুতরাং তাহারা সমূহ পরিমাণে খাদ্যাহরণ করিতে পারে। ইহা বিশেষরূপে স্মরণ রাখা উচিত যে, মূলগণ পাদদেশে বা গোড়ায় সঙ্কুচিত ভাবে অবস্থান করে না বরং ক্রমাগতই চারিদিকে প্রসারিত হইতে চাহে। সঙ্কীর্ণ ও নির্দ্দিষ্ট স্থান মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে শীঘ্রই তাহাদিগের আহারাভাব হয় সুতরাং বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া মূলগণকে বহুদূর ধাবিত হইতে হয়। ইহাতে উদ্যম নষ্ট হয়, বৃদ্ধিশীলতা সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয়, ফলপ্রসবিনীশক্তি হ্রাস পায়। একতঃ কৃষিফসল

ঘনভাবেই রোপিত হয়, এ অবস্থায় মূলগণ যদি ভূগর্ভ মধ্যে অবাধে বৃদ্ধি পাইবার সুযোগ না পায় তাহা হইলে তাহাদিগের সুবৃদ্ধি ও ফলন-ফুলনের আশা থাকে না। এদেশে প্রতিনিয়ত যে অনটন ও দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হয় তাহার মুল কারণই ভাসা-চাষ। বর্ষাকালের ফসলের জন্য ভাসা-চাষে (Shallow Cultivation) চলিতে পারে কিন্তু তাহাও স্থান ও মাটী নির্ব্বিশেষে নহে। বর্ষাকালে মাটী রসা থাকে বলিয়া গাছের মূলগণ সহজেই ভূগর্ভে প্রবেশ করিতে পারে। তাহা ব্যতীত সরসতা নিবন্ধন মাটীর উপাদানসমূহ নিত্য নিরন্তর বিগলিত ও বিশ্লিষ্ট হইতে থাকায় খাদ্যাহরণে উদ্ভিদগণের তত ক্লেশ হয় না, কিন্তু তাহা হইলেও জমিতে গভীর চাষ দেওয়া থাকিলে রস ও সার ক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইতে পারে না বরং সেই পদার্থ সমুদায় ভূগর্ভমধ্যে নামিয়া ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য মজুত থাকে।

ভাসা বা অগভীর কর্ষণ হেতু উদ্ভিদের শিকড়গণ ভূগর্ভ মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে না পারায় সামান্য বৃষ্টির অভাব হইলেই, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উদ্ভিদগণ শীর্ণ হয়, অকালে তাহাদিগের বৃদ্ধি লোপ পায়। ভূমি গভীর-কর্ষিত হইলে একদিকে তাহারা যেরূপ বহু ও দীর্ঘমূলক হয়, সেইরূপ ভূগর্ভের নিম্নদেশ হইতে সমূহ পরিমাণে রস আহরণ করিতে সমর্থ হয়, ফলতঃ অল্প বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হেতু তত ক্লেশ ভোগ করে না।

মৃত্তিকা-চূর্ণন।—হলচালনার অনিবার্য্য ফল—ভূমি বিদারণ। পুনঃ পুনঃ হলচালনার দ্বারা মৃত্তিকা চূর্ণীকৃত হয়। যে কয়টী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভূমি কর্ষিত হয়, তন্মধ্যে মৃত্তিকা চূর্ণন সর্ব্বপ্রধান। বীজ অঙ্কুরিত হইয়া যাহাতে সহজে ভূগর্ভ

মধ্যে মূল প্রসারিত করিতে এবং ভূগর্ভ হইতে রস ও খাদ্য আহরণ করিতে সক্ষম হয়, তাহারই সহায়তা করিবার জন্য মৃত্তিকাকে সাধ্যমত চূর্ণ করিতে হয়। ভূগর্ভস্থ আহারীয় যত বিশ্লিষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মূলগণের নিকটস্থ হইয়া থাকে, উদ্ভিদ তত তেজাল হয় এবং তত শীতোষ্ণ ও অনাবৃষ্টিসহ হয়। যে সময়ে রবি-ফসল ক্ষেত্র অধিকার করিয়া থাকে, সে সময়ে প্রায় বৃষ্টি হয় না, কিম্বা যাহা কিছু হয় তাহাও সামান্য, এবং তদ্দ্বারা ফসলের বিশেষ উপকার হয় না। ধান্য যেরূপ বিশিষ্ট ও বর্ষাকালের ফসল, গোধূমও সেইরূপ অতি প্রয়োজনীয় ও শুষ্ক ঋতুর ফসল। বর্ষাকালের জল ভূগর্ভে সঞ্চিত থাকে বলিয়া গোধূমাদি রবি-খন্দের তাবৎ ফসল সেই রস আহরণ করিয়া জীবিত থাকে, বর্দ্ধিত হয় ও ফসল প্রদান করে। এ দেশে গভীর চাষের পদ্ধতি নাই বলিয়া বৃষ্টির তাবৎ জল ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইতে পায় না এবং নিম্নস্তরের দৃঢ়তা হেতু নিম্নদেশের রস উপরিভাগে তত উঠিতে পারে না।

ভূমির স্ফীতি।—মৃত্তিকা চূর্ণন দ্বারা আর একটী বিশেষ ফললাভ হইয়া থাকে—ভূমির আয়তন বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ভূপৃষ্ঠ যতক্ষণ কঠিনাবস্থায়পতিত থাকে ততক্ষণ তাহার মাত্র পৃষ্ঠদেশ (Surface) থাকে এবং তহোকে জরিপ করিয়া আমরা জমির পারমাণ নির্দ্দেশ করি। দীর্ঘ ও প্রস্থ লইয়া উক্ত পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয়-গৃহাদি নির্ম্মাণ জন্য অথবা অপর নানা কার্য্যের জন্য উল্লিখিত নিয়মে জমির পরিমাণ নির্দ্দেশ করিলে চলিতে পারে, কিন্তু চাষ-আবাদের জন্য দীর্ঘ ও প্রস্থের সহিত ভূগর্ভদেশেরও কিয়দংশ না লইলে প্রকৃত জরিপ হয় না। চাষ-আবাদের জন্য ভূমির পৃষ্ঠ

দেশের যেরূপ প্রয়োজন, ভূগর্ভ ততোধিক প্রয়োজন। কেবল উপরি ভাগ লইয়া চাষ-আবাদ চলে না। এক বিঘা ভূমি দীর্ঘে ৮০ ও প্রস্থে ৮০ হাত হয় এবং তাহার বর্গফল ৬৪০০ হাত। আচোট সমতল ভূমির ইহাই প্রকৃত মাপ। উক্ত এক বিঘা জমির ৪ অঙ্গুলি মাটি উত্তমরূপে কর্ষিত ও চূর্ণীকৃত হইলে আবাদের জন্য (৮০×৮০×$\frac{৪}{২৪}$) ১০৬৬$\frac{২}{৩}$ ঘন-হাত মাটী পাওয়া যায়।* কিন্তু সেই এক বিঘাকে আট অঙ্গুলি গভীর করিলে ২১৩২...ঘন হাত মাটি আমাদিগের আয়ত্ত মধ্যে আসে, এ লাভ বড় সহজ নহে। গভীর কর্ষণও সুচূর্ণন দ্বারা আমরা নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রের আয়তনকে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুর্গুণ বর্দ্ধিত করিতে পারি। এইরূপে এক বিঘা হইতে চারি বিঘার ফসল উৎপন্ন করিতে পারি, সুতরাং তিন বিঘা জমির খাজনা বাঁচিয়া যায়, বহুল পরিমাণে আবাদ-খরচা, পরিদর্শন-শ্রম প্রভৃতিও বাঁচিয়া যায়! অঙ্কশাস্ত্র যেরূপ সত্য, ইহাও সেইরূপ অকাট্য সত্য। মাটী যত ভালরূপে চূর্ণ হইবে জমি তত স্ফীত হইয়া উঠিবে, কোমল ও স্থিতিস্থাপক হইবে, সঙ্গে সঙ্গে জমির আয়তন বাড়িবে। ভূমি কর্ষিত হইলেও যদি ঢেলা পূর্ণ হয়, তাহা হইলে ক্ষেত্রের আয়তন বৃদ্ধি না পাইয়া কার্য্যতঃ হ্রাস পাইয়া থাকে। জমি ঢেলাময় থাকিলে ঢেলাদ্বারা বহু জমি অধিকৃত হইয়া থাকে, তন্নিবন্ধন যথাপরিমাণ ফসলের স্থান হয় না। এই হিসাবে দেখা যায়—অসম্পুর্ণ কর্ষণের ফলে ক্ষেত্রের আয়তন হ্রাস পায়।

এতদ্দ্বারা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, আবাদী ক্ষেত্রের মাপ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে মাত্র দীর্ঘ ও প্রস্থের মাপ গুণন

* ২৪ অঙ্গুলি ১ হাত হয়।

করিলেই প্রকৃত কথা বুঝা যায় না, ভূগর্ভের যে কয় ইঞ্চ বা যে কয় অঙ্গুলিকে কর্ষণ করা যায় তাহাকেও ইহার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। সাধারণতঃ কৃষকগণ যে ভাবে ভূমি কর্ষণ করে তাহাকে প্রকৃতপক্ষে ভাসা-চাষ মাত্র বলিতে পারা যায়। দেশী হাল দ্বারা ইহাপেক্ষা অধিক প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না। গভীর কর্ষণের মূল—আধুনিক উন্নত লাঙ্গল। এতদর্থে গ্রন্থকার মনে করেন, 'হিন্দুস্থান' লাঙ্গল ("Hindustan Turn-Wrist plough) সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও কার্য্যকরী। ইহাদ্বারা ৯-ইঞ্চ বা এক বিতস্তি ভূগর্ভ উত্তমরূপে উন্টাইয়া যায়, অল্পক্ষণে অধিক কাজ হয়। গরীব কৃষকদিগের দ্বারা উক্ত হাল ব্যবহৃত হওয়া একেবারেই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, কারণ উহার মূল্য অধিক—প্রত্যেকখানি লাঙ্গলের মূল্য ১২৲ টাকা হইতে ১৩৲ টাকা। দ্বিতীয়তঃ উক্ত হলচালনার্থ উচ্চ, সবল ও দৃঢ়কায় বলদের প্রয়োজন। ঈদৃশ বলদের মূল্যও অধিক, খোরাকও অধিক।

মৃত্তিকাকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিবার জন্য বিলাতী বিদের (Harrow) অনুরূপ বিদে নির্ম্মাণ করিতে হইবে। দেশী বিদের একপংক্তি শলাকা থাকে তদ্দ্বারা মাটী তাদৃশ চূর্ণ হয় না, এজন্য ৩।৪ পংক্তি দীর্ঘ শলাকা দ্বারা বিদে নির্ম্মাণ করাইয়া লইলে কার্য্য সংক্ষেপ হয়, অথচ মৃত্তিকা উত্তমরূপে চূর্ণ হইয়া যায়।

রস সংরক্ষণ।—ভূমি কর্ষিত হইলে রৌদ্র ও বাতাসে মাটীর রস শুকাইয়া যায়, এই ধারণা চিরদিন চলিয়া আসিতেছে। উক্ত ধারণা যে ভ্রান্তিমূলক, তাহা নহে, কারণ হলচালিত হইলে মাটীর ভিতর যথেষ্ট বায়ু ও রৌদ্র প্রবেশ করে, তন্নিবন্ধন মাটী শুকাইয়া যায়—ইহা সহজে বুঝিতে পারি

কিন্তু ঈষৎ ধীরভাবে বিচার করিলে আরও অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারি। ইতিমধ্যে আমরা জানিয়াছি যে, মাটী স্বভাবতঃ রসা অবস্থায় থাকে এবং ভূপৃষ্ঠ হইতে যত নিম্নদেশে যাওয়া যায় তত দেখিতে পাই যে মাটী সমধিক রসাল, তাহারও নিম্নদেশস্থ মাটী কর্দ্দমবৎ, আবার তাহারও নিম্নদেশ খনন করিলে নির্ম্মল জলরাশি। কূপ বা পুষ্করিণী খননকালে ভূগর্ভের প্রত্যেক স্তরই যে রসাল হইতে রসালতর তাহা সুস্পষ্টই দেখা যায়।

যৌগিকতা।—ভূপৃষ্ঠ কর্ষিত হইলে মাটীর ঘনতা দূর হয়, রস শোষণ করিবার শক্তি বাড়ে, সুতরাং বর্ষাকালের তাবৎ বৃষ্টির জল ভূমি আহরণ করিতে সক্ষম হয়। এইরূপে আহরিত রস তাবৎ মৃত্তিকারাশিকে সিক্ত করিতে করিতে ছিদ্রপথ অবলম্বনে ভূগর্ভের নিম্নতম দেশে গিয়া স্থান প্রাপ্ত হয়, শোষণকালে মৃত্তিকার স্বাভাবিক গঠনানুসারে অল্প বা অধিক রস মাটীতে থাকিয়া যায়, অবশিষ্টাংশই তলদেশে গিয়া পড়ে। উক্ত তলদেশের নাম (Water level বা বারিস্তর। ভূমির স্বাভাবিক উচ্চতা ও মৃত্তিকার ধারকতানুসারে উক্ত বারিস্তর ভূপৃষ্ট হইতে অধিক বা অল্প নিম্নে অবস্থিত। মহাসাগরের পৃষ্ঠদেশই পৃথিবীর সাধারণ জলস্তর। মহাসাগরের পৃষ্ঠদেশ হইতে যে দেশ যত উচ্চ, সে দেশের বারিস্তর তত গভীর ভূগর্ভ মধ্যে অবস্থিত। যাহা হউক, ভূগর্ভস্থ বারিস্তর নিরন্তর জলপূর্ণ থাকে। যৌগিক-আকর্ষণ (Capillary attraction) দ্বারা সেই জল পৃষ্ঠভাগে উঠিয়া উদ্ভিদ-মূলদিগকে রস সরবরাহ করিয়া থাকে। মাটী সুকর্ষিত ও ঈষৎ দৃঢ় থাকিলে কোন উদ্ভিদের কখনও রসাভাব হয় না। ফসলের জন্য রসের স্বচ্ছলতা রাখিতে হইলে সুকর্ষণের প্রয়োজন। মাটীর ভিতর

বেশী ঢেলা বা চাপ থাকিলে কিম্বা মাটী অতিশয় আলগা থাকিলে যৌগিক-আকর্ষেণের প্রতিবন্ধক হয়। পিচ্‌কারি দ্বারা জল শোষণ করিবার কালে দেখা যায় যে, উক্ত পিচকারীর গাত্রে অধিক বা বড় ছিদ্র বা ফাটল থাকিলে তাহাতে অধিক জল উঠে না। সেইরূপ মাটি বেশী ফাঁপা থাকিলে অধিক জল উঠিতে পারে না, এবং যাহা উঠে তাহাও বায়ু ও রৌদ্রে শুকাইয়া যায়।* ভূপৃষ্ঠ দৃঢ় ও কঠিন হইয়া থাকিলে যৌগিক-আকর্ষণ আপাততঃ বন্ধ থাকে। এক পশলা প্রবল বৃষ্টি হইয়া গেলে ভূপৃষ্ঠ সুসমতল হইয়া যায়, ছিদ্রপথের মুখাগ্রভাগে অতি সূক্ষ্ম কণা পড়িয়া উক্ত মুখ সকল রুদ্ধ হইয়া যায়। অনন্তর ২।৪ দিবস পরে, ভূগর্ভের সহিত বায়ু আলোক ও রৌদ্রের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ ঘটে, গাছ সকল ক্রমশঃ বিবর্ণ ও শীর্ণ ভাব ধারণ করে, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কর্ষিত ভূমিকে সর্ব্বদা সরস রাখিবার জন্য ভূপৃষ্ঠের অন্ততঃ এক ইঞ্চ মাটীও অল্পাধিক ঝুরা রাখা কর্ত্তব্য, কারণ তাহা হইলে ভূগর্ভে বায়ু ও উত্তাপ প্রবেশ করিতে পারিয়া যৌগিকতাকে সজীব রাখে।

চাদর।—যৌগিকতার সংরক্ষণের জন্য ভূমির পৃষ্ঠভাগকে ঝুরা রাখিতে হয়। উক্ত ঝুরা মাটীর আবরণকে ইংরাজিতে (Mulching) কহে। ফল ফুল গাছের গোড়ায় মাটীতে নিড়ান করিবার সময় মাটীকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়, এতদ্দ্বারা উক্ত আবরণের কাজ হয়। গাছের গোড়ায় সারচূর্ণ প্রসারিত করিয়া দিলেও আবরণের কাজ হয়। বাস্তবিক, এতদুপায়ে গাছের গোড়া সর্ব্বদা সরস থাকে, ফলতঃ উদ্ভিদও প্রফুল্ল থাকে।*

* বহিরাবরণ বা Mulching সম্বন্ধে মৎকৃত মৃত্তিকাতত্ত্ব নামক পুস্তকে বশেষ আলোচনা আছে।

ঈদৃশ আবরণকে গ্রন্থকার চাদর বা মাল্‌চা নামেও অভিহিত করেন।

যৌগিকতাকে পূর্ণাবস্থায় রাখিবার জন্য হলচালনাদির পর গুরুভার চৌকী বা রোলার দিলে কর্ষিত মৃত্তিকা দৃঢ়রূপে বসিয়া যায় এবং নিম্ন ও উপরিস্তরের মধ্যে পুনরায় ছিদ্রপথ সংস্থাপিত হয়। অতঃপর ভূপৃষ্ঠোপরি ঘন ও বহু শলাকাপূর্ণ প্রশস্ত বিদে পরিচালিত করিলে এক ইঞ্চ গভীর মাটী ঝুরা ও আল্‌গা হইয়া যায়—ইহাই হইল প্রকৃত চাদর বা মাল্‌চা। কর্ষিত মাটীকে সরস রাখিবার জন্য নীলকুটীয়াল সাহেবগণ কাষ্ঠনির্ম্মিত রোলার ব্যবহার করিয়া থাকেন।

অল্পে-বহু।—ভারতের কৃষককে বিনা জলে চাষ-আবাদ করিতে হয় সুতরাং ক্ষেত্রে রসের সরবরাহ রাখিবার জন্য যাহা কিছু কর্ত্তব্য তৎ-সমুদায়ই করিতে হইবে। শ্রম বা ব্যয়াধিক্য ভয়ে পশ্চাৎপদ হইলে বর্ত্তমান অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। চারি পাঁচ বিঘা জমিতে উচ্ছৃঙ্খলভাবে আবাদ না করিয়া ২।১ বিঘায় প্রকৃষ্ট প্রণালীতে আবাদ করিলে সমধিক লাভবান হওয়া যায়। পাঁচ বিঘার শ্রম ও অর্থব্যয় দুই বিঘায় নিয়োজিত হইলে তিন বিঘা জমির খাজনা বঁচিয়া যায় উপরন্তু পাঁচ বিঘা জমির প্রচলিত ফলন অপেক্ষা অধিক ফসল পাওয়া যায়। অতএব প্রকৃষ্ট প্রণালীর আবাদই যে শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে সংশয় নাই।

জলাভাব হইলে আমরা কোন ফসলই উৎপন্ন করিতে পারি না কাজেই দুর্ভিক্ষের নিষ্পেষণে, অজন্মার তাড়নায় আমরা রুগ্ন ও ক্লিষ্ট হইয়া অনশনে মরিয়া যাই! আমরা কৃষিপ্রধান জাতি বলিয়া জগতে আত্মপরিচয় দিই কিন্তু বল দেখি, কৃষিবিষয়ে প্রাধান্যের

আমাদিগের কি আছে। কৃষিপ্রধান হইলে, আমাদিগের কৃষির সমুন্নত প্রণালীপদ্ধতি, কৃষির সমুন্নত সাজ-সরঞ্জাম কিছু-না-কিছু থাকিতই। আমাদিগের সে-সব কিছুই নাই। শতবৎসর পূর্ব্বে কৃষিবিষয়ে আমাদিগের যেরূপ অবস্থা ছিল, কৃষির যে সকল প্রণালীপদ্ধতি বা উপকরণ ছিল, তৎসমুদায়ের এক বিন্দু কি পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে! শত বৎসরের পূর্ব্বে কৃষক যাহা করিয়াছে, আজকার কৃষক ও ঠিক তাহাই করিতেছে, ইহা দেখিয়া কিরূপে বলিব যে, আমরা কৃষি প্রধানজাতি?

উদ্ভিদ-রস।—জীবের শরীর ধারণার্থে শোণিতের যেরূপ প্রয়োজন, উদ্ভিদজ্জীবনের পক্ষে রসও সেইরূপ অবশ্য প্রয়োজন। এজন্য উদ্ভিদ-শরীরে যাহাতে রসাভাব না হইয়া বরং যথাযোগ্য পরিমাণে রস থাকিতে পারে, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য, কারণ ভূগর্ভস্থ রসই উদ্ভিদগণ আহরণ করতঃ জীবিত থাকে, পরিপুষ্ট হয়, বর্দ্ধিত হয় ও ফলফুল প্রদান করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যে সকল উদ্ভিদকে রস আহরণের জন্য বহুদূর মূল প্রসারিত করতঃ অতি কষ্টে রস আহরণ করিতে হয় তাহাদিগের প্রায় তাবৎ শক্তিই উক্ত কার্য্যে নিঃশেষিত হয়, ফলতঃ তাহাদিগের উদ্ভিদাংশ পরিবর্দ্ধিত না হইয়া ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়, শাখা পল্লবাদি শীর্ণ হয়, পত্রায়তন ক্ষুদ্র হয়, পত্রের সংখ্যা হ্রাস হয়, বর্ণ জ্যোতিহীন হয় এবং তাহারই অনিবার্য্য ফলস্বরূপ তাহারা ফলপুষ্পধারণে তাদৃশ সক্ষম হয় না।

মাটীর সরসতা সংরক্ষণের জন্য ভূমিকে গভীররূপে কর্ষণ করিতে হয়। কর্ষণের অবশ্যম্ভাবী ফলে ভূগর্ভস্থ রস, রৌদ্র ও বায়ু প্রভাবে, ভূপৃষ্ঠাভিমুখে উত্থিত হইতে থাকে, এবং এই সুযোগে,

উদ্ভিদের মূলগণ রস আকর্ষণ করিয়া লয়। কেবল তাহাই নহে, কারণ উক্ত রসের সহিত ভূগর্ভস্থ নানাবিধ জৈব (Organic) ও অজৈব (Inorganic) পদার্থের সার একাঙ্গীভূত হইয়া থাকে, সুতরাং তৎসমুদায় উদ্ভিদপোষণকারী সামগ্রীও সেই রসের সহিত উদ্ভিদশরীরে প্রবেশলাভ করে।

গভীর কর্ষণে ভূমির যেরূপ আয়তন বৃদ্ধি পায়, সেই অনুপাতে সরসতা ও রসের প্রবাহিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়। এতদ্ব্যতীত তজ্জনিত কতকগুলি ভৌতিক শক্তি সমুদ্ভূত হইয়া মৃত্তিকার অসাড়তা বিদূরিত করতঃ নবশক্তির সঞ্চার করিয়া থাকে।

জমি সুকর্ষিতাবস্থায় থাকিলে বৃষ্টির যাবৎ জলই ভূগর্ভ মধ্যে পরিশোষিত হইতে পারে, কিন্তু তদভাবে অত্যাধিক জল উথলিত হইয়া প্রবাহবেগে ক্ষেত্রান্তরে বা অন্যত্র গিয়া পড়ে কিম্বা ক্ষেত্রমধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া মাটীকে ঘন ও দৃঢ়রূপে চাপিয়া দেয়, মৃত্তিকার ছিদ্রপথসমূহকে নিষ্পেষিত করিয়া দেয়, ফলতঃ শোষণ ও বর্জন শক্তি অপহৃত হয়। এ সকলের অনিবার্য্য ফলস্বরূপ স্থানীয় স্বাস্থ্য দূষিত হইয়া থাকে। স্থানীয় স্বাস্থ্যের সহিত সুকর্ষণের কত নিগূঢ় সম্বন্ধ তাহা ইহা হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। যাহা হউক, এই সম্বন্ধে অত্যাধিক বিতণ্ডা আছে কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক নহে বলিয়া এ স্থলে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা উচিত।

* প্রাচীন সম্প্রদায় মতে, গভীর কর্ষণে স্থানীয় আবহাওয়া দূষিত হইয়া থাকে, তন্নিবন্ধন স্থানীয় অধিবাসীগণ রোগগ্রস্থ হয়। অকর্ষিত ভূমিতে জল আবদ্ধ থাকিলে সেই জল ও ঘাসপাতা প্রভৃতি পচিয়া যত অনিষ্ট করে, কিন্তু ভূমির শোষণশক্তি থাকিলে তাবৎ জলই ভূগর্ভ মধ্যে নামিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ক্ষেত্রস্থ আর্দ্রতা—তজ্জাত

ফসলের কাণ্ড পত্রাদির হরিৎ অংশ দিয়া বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে চলিয়া যায়। এই জন্য উদ্ভিদকে রস-পরিশোষক যন্ত্রস্বরূপ বলিতে পারা যায়। আর্দ্র ও শৈত্য ভূমির সিক্ততা দূর করিবার জন্য ক্ষেত্র মধ্যে বা মাঠে-ঘাটে বৃহৎ বৃহৎ ঝাউ গাছ রোপিলে অসংখ্য পত্রের শ্বাস-কূপ (Stomata) দ্বারা রস বহির্গত হইয়া যায়। সামান্য একটী ক্ষুদ্র উদ্ভিদ প্রতি চব্বিশ ঘণ্টা মধ্যে কত রস শোষণ ও বর্জ্জন করে তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে একটী বোতল বা শিশিতে জল রাখিয়া তাহাতে একটী গাছ রাখিয়া দিতে হয়। অতঃপর বোতল বা শিশির মুখটী ছিপিদ্বারা বদ্ধকরতঃ তাহার আসে-পাশে মোম বা গালার প্রলেপ দিলে, বাহিরের উত্তাপ ও বাতাসে ছিপির ভিতর দিয়া বোতলের জল উপরে আসিতে পারে না। এইরূপ দুই একদিন রাখিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, প্রতিদিন কত জল সেই উদ্ভিদাঙ্গ দিয়া বহিষ্কৃত হইয়া যাইতেছে। পত্র সংখ্যা যত অধিক হইবে, রস তত অধিক বহির্গত হইবে। আবার ছায়া অপেক্ষা খোলা জায়গায় উক্ত বোতল সমেত গাছটী রাখিলে শেষোক্ত স্থানে অবস্থানকালে অধিক রস নির্গত হয়। যাহা হউক, এতদ্দ্বারা বেশ বুঝা গেল যে, উদ্ভিদগণ শোষক-যন্ত্র (Pump) স্বরূপ এবং ইহারা ভূমির রস শোষণ করতঃ পত্র কূপদ্বারা তাহা বহিষ্কার করে। এক্ষণে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ক্ষেত্রের কর্ষণ থাকিলে স্থানীয় আবহাওয়া দূষিত না হইয়া পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। রসা-দেশে বৃক্ষরোপণের ইহা একটী বিশেষ উদ্দেশ্য।

অকর্ষণ।—সুকর্ষণদ্বারা ক্ষেত্রের সরসতা রক্ষা হয়, ক্ষেত্রে রস সঞ্চিত থাকে, ভূগর্ভস্থ সারাল পদার্থসমূহ আলোক, রৌদ্র ও

বাতাস সহযোগে বিগলিত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া অনণুমেয় ক্ষুদ্রকণায় পরিণত লাভকরতঃ উদ্ভিদমূলে প্রবিষ্ট হইবার উপযোগী হয়—এ সকল কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কিন্তু কর্ষিত না হইলে মাটিতে রসাভাব হয় কেন, এক্ষণে তাহারই আলোচনা করিব। ক্ষেত্র-প্রান্তর অকর্ষিতাবস্থায় পতিত থাকিলে মাটি জমাট বাঁধিয়া এতই কঠিন হইয়া যায় যে, তাহাতে হলপ্রবাহ একবারেই অসম্ভব হইয়া পড়ে, কুদ্দাল প্রত্যাখ্যাত হয়। ভূমি এইরূপে জমাট বাঁধিয়া গেলে তাহার ছিদ্রপথ (Capillary tubes) সমূহ এতই সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে যে, তন্মধ্যে বায়ু বা রৌদ্রোত্তাপ একবারেই প্রবেশ করিতে পারে না, বৃষ্টির জলও তন্মধ্যে শোষিত হইতে না পাইয়া স্থানান্তরে গিয়া পড়ে। মৃত্তিকা মধ্যে বায়ুর অবস্থান হেতু ভূমির ছিদ্রপথসমূহ স্ফীত ও সরল থাকে, ফলতঃ ভূগর্ভ মধ্যে রস, বায়ু ও উত্তাপ অবাধে চলাচল করিতে সমর্থ হয়। এই অবস্থাকে ভূমির সজীব অবস্থা কহে। কর্ষিত ভূমিকে পতিতাবস্থায় থাকিতে দিলে অল্পাধিককালমধ্যে মাটি দৃঢ় হইয়া ক্রমশঃ বসিয়া যায়। ভূপৃষ্ঠোপরি যে গুরুভার নিরন্তর বিরাজিত রহিয়াছে তাহারই ভার হেতু মাটি দৃঢ় ও কঠিন হইয়া যায়। উক্ত গুরুভার পদার্থ—বাতাস। সমগ্র পৃথিবীময়—জল-স্থল, গিরিগুহা নির্ব্বিশেষে সকল স্থান ব্যাপিয়া—বায়ু বিরাজিত। উক্ত তরল পদার্থ সকল জীবকে বহন করিতে হইতেছে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, কেহই তাহা অনুভব করে না, কারণ জীব ও উদ্ভিদ সকলেই জন্মগ্রহণ করিবার মুহূর্ত্ত হইতেই তাহার ভার বহণ করিতে সমর্থ ও অভ্যস্থ হইয়াছে। বাতাসের গুরুত্বের কথা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয় কারণ পৃথিবীময় প্রতি বর্গ-ইঞ্চ স্থানে পনর পাউণ্ড (প্রায় ৴৭৷৹ সাড়ে সাত সের)

বায়ু সদা বিদ্যমান এবং উক্ত পনর পাউণ্ড মধ্যে বারো পাউণ্ড (প্রায় ৶৬ ছয় সের) নাইট্রোজন। মৃত্তিকাকণাসমূহ জড়পদার্থ বলিয়া উক্ত বায়ুর ভার বশতঃ ক্রমশঃ বসিয়া যায়, মাটি দৃঢ় হয় ও জমাট বাঁধে। বায়ুর স্বভাবই এই যে, স্থান পাইলেই উহা তন্মধ্যে গিয়া আশ্রয় লয়। সৃষ্টিমধ্যে কণা-পরিমাণ স্থান শূন্য থাকে না। এই জন্য ভূমি কর্ষিত হইলেই ফাটাল ও ঢেলা পরস্পর মধ্যে যে শূন্যের বা আকাশের আবির্ভাব হয় তাহাতেই তন্মুহূর্ত্তে বায়ু প্রবেশ করে, সেই সঙ্গে নাইট্রোজেনও প্রবেশ করে। আলোক ও উত্তাপ যে, তৎসঙ্গে প্রবেশাধিকার পাইবে, তাহা সহজেই বুঝিয়া লইতে হইবে।

ভূগর্ভ মধ্যে স্বভাবতঃ রসের প্রাদুর্ভাব হেতু তন্মধ্যে বায়ু প্রবিষ্ট হইবামাত্র উক্ত নাইট্রোজেন রস মধ্যে সংযোজিত হইয়া ভৌতিক ক্রিয়াবশে নাট্রিক-এসিড নামক দ্রাবকে পরিণত হয়, ফলতঃ মাটি উর্ব্বরা হয়। এতদ্দ্বারা দেখা যায়, মাত্র কর্ষণ দ্বারা সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে মৃত্তিকার কত উপকার সংসাধিত হয়। যে পরিমাণে মৃত্তিকার গভীর কর্ষণ হয়, মাটি সুচূর্ণীত হয়, সেই পরিমাণে উক্ত পদার্থ মৃত্তিকার আশ্রয় লাভ করে।

ক্ষেত্রের ফাটল।—ক্ষেত-পাথার ফাটিয়া যাওয়া কোন ক্রমেই স্পৃহনীয় নহে। যে সকল জমিতে চাষ-আবাদ হয় না, সে সকল জমিকে প্রায় ফাটিতে দেখা যায় না কিন্তু আবাদী-জমি, বর্ষা অতীত হইলে, যত দিন যাইতে থাকে তত ফাটিতে থাকে। বর্ষার ফসল সংগৃহিত হইবার অব্যবহিত পরে ক্ষেত্রকে কর্ষণ না করিলে মাটি ফাটিতে থাকে,—ইহা আমরা দেখিতে পাইতেছি। আমন ধান্য সংগৃহিত হইবার পর মাঠে গেলে দেখা যায়, মাঠ সকল

ফাটিয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় সে সকল ক্ষেত্রকে আবাদ করা অতিশয় কঠিন কার্য্য। এই সকল ফাটল বহু গভীর হয়, তন্নিবন্ধন ফাটলের চারিপার্শ্ব দিয়া ভূগর্ভের বহু নিম্ন হইতে রাশি রাশি রস শুষ্ক হইয়া যায়, মাটির ছিদ্র পথ সমূহ ভাঙ্গিয়া যায়, ফলতঃ ভূগর্ভের সহিত উপরিভাগস্থ মৃত্তিকার সম্বন্ধ বিলুপ্ত হয়। এই জন্য ভূপৃষ্ঠকে আদৌ ফাটিতে দেওয়া উচিত নহে। ফসল উঠিয়া যাইবার অব্যবহিত পরেই, অধিক কি, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎই ক্ষেত্রকে উত্তম রূপে কর্ষণ করিলে ভূপৃষ্ঠ ফাটিবার আর সম্ভাবনা থাকে না। এক ফসল সংগৃহিত হইবার পর সেই জমিতে আপাততঃ কোন ফসলের আবাদ করিবার প্রয়োজন, ইচ্ছা বা সঙ্কল্প না থাকিলেও কর্ষণাদি দ্বারা ভূপৃষ্ঠের মাটিকে চূর্ণ করিয়া রাখিতে হয়। এইরূপে ক্ষেত্রকে কর্ষণ করতঃ পতিত থাকিতে দিলেও ক্ষেত্রের রসালতা নষ্ট হয় না, মৃত্তিকার ছিদ্রপথ সমূহ ক্রমে পুনর্গঠিত হইয়া উঠে, অথচ রৌদ্র, বায়ু, শিশির প্রভৃতি মৃত্তিকা মধ্যে প্রবেশের পথ পায়, মাটির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ভূগর্ভ মধ্যে রস, উত্তাপ প্রভৃতি চলাচল হইবার পক্ষে ছিদ্রপথ সমূহ একমাত্র অবলম্বন।

উদ্ভিদ খাদ্য।—কর্ষণ দ্বারা ভূগর্ভস্থ উদ্ভিদ খাদ্য কিরূপে আহরণোপযোগী হয়, তাহা দেখা যাউক। যে সকল উপকরণ লইয়া মৃত্তিকার উৎপত্তি ও অবস্থান তৎসমুদয়ই প্রায় উদ্ভিদের খাদ্য, কিন্তু উক্ত পদার্থসমূহ সকল সময়েও সকল অবস্থায় প্রভূত পরিমাণে উদ্ভিদের আহরণোপযোগী অবস্থায় থাকে না। ভূগর্ভ মধ্যে উদ্ভিদ খাদ্যের পরিসীমা নাই, ইহা আর বেশী করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না। প্রতিনিয়ত দেখিতে পাইতেছি যে অসংখ্য অসংখ্য বৃক্ষ-লতা স্বতঃই এবং যথা তথা জন্মিতেছে বর্দ্ধিত

হইতেছে, আবার কাল পূর্ণ হইলে মরিয়া যাইতেছে। ইহাদিগকে কেহ লালনপালন করে না কিম্বা ইহাদিগের আহরণোপযোগী খাদ্যাদির কেহ সংস্থান বা ব্যবস্থা করিয়া দেয় না। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, ভূগর্ভমধ্যে কত উদ্ভিদখাদ্য নিরন্তর বিদ্যমান! দীর্ঘজীবি বৃক্ষলতাদি বহু ও দীর্ঘমূলক হইয়া থাকে, তন্নিবন্ধন তাহাদিগের মূল পার্শ্বদেশে নানাদিকে ও ভূগর্ভমধ্যে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া আপনাপন আহার্য্য সংগ্রহ করে। ইহাদিগের কখনও আহারীয়ের অভাব হয় না, কিন্তু এক বা দুইঋতুজীবি উদ্ভিদগণের তাদৃশ দীর্ঘ বা অধিক মূল থাকে না, ফলতঃ তাহাদিগের মূলগণ ভূগর্ভমধ্যে, পার্শ্বদেশে বা নিম্নভাগে অধিক দূর যাইতে পারে না সুতরাং তাহাদিগের বৃদ্ধি, পরিপুষ্টি বা ফলন-ফুলনের জন্য আমাদিগকে নানা উপায় অবলম্বন করতঃ খাদ্যরসাদি মূলের নিকটস্থ করিয়া দিতে হয়। কেবল তাহাই নহে। যাহাতে ভূগর্ভে আহারীয় সামগ্রী সর্ব্বদা ব্যবহারোপযোগী অবস্থায় থাকিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হয় এবং প্রয়োজন বোধ করিলে, ভূমিতে সারপ্রদান ও জলসেচন করিতে হয়। ইতিপূর্ব্বে এ কথা বলিয়াছি যে, নিকটে ও সহজে আহার্য্য না পাইলে জীবগণের ন্যায় উদ্ভিদগণকেও নিতান্ত ক্লেশ স্বীকার করিয়া বহুদূর হইতে ও বহু কষ্টে আহার্য্যের সংস্থান করিতে হয়, তন্নিবন্ধন তাহাদিগের উদ্যম—শক্তি—তৎপরতা অনর্থক নষ্ট হয়, কিন্তু সেই উদ্যমাদি নষ্ট হইতে না পাইলে এবং সহজে প্রয়োজনমত আহার্য্য আহরণের উপায় থাকিলে তাহাদিগের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। সুকর্ষণের ফলে মৃত্তিকা চূর্ণ হয় বলিয়া ভূগর্ভে জল, বায়ু

ও আলোক অবাধে প্রবেশ করতঃ ভূগর্ভস্থ লুক্কায়িত সার ও ভূমির আবদ্ধ বা প্রচ্ছন্ন শক্তির সহিত সম্মিলিত হইয়া উক্ত সারকে বিগলিত করে অপিচ ভূমির শক্তিকে উদ্দীপিত করে। এতদ্ব্যতীত বায়ুর সহিত যবক্ষারজান (Nitrogen) প্রবিষ্ট হয়। এই সকলের একত্র সমাবেশ ফলে একদিকে যেরূপ ক্ষেত্রস্থ জৈব ও অজৈব পদার্থ সকল বিগলিত হইতে থাকে, অন্যদিকে তন্মধ্যে জীবাণু উৎপন্ন হইয়া যবক্ষারজানকে আহরণ করতঃ দ্রাবকে পরিণত করিয়া উদ্ভিদের আহরণোপযোগী করিয়া দেয়। অতঃপর ইহাও দেখা যায় যে, যবক্ষারজনিত দ্রাবকের সংস্রবে ক্ষেত্রের নিরেট, ঘন, অজৈব পদার্থও বিশ্লেষিত হইয়া উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী হইয়া উঠে।

রস ও বায়ু।—কৃষিকার্য্যের সৌকর্য্যার্থে মৃত্তিকা মধ্যে বায়ু ও রস—এতদুভয়েরই বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু উহাদিগের প্রত্যেকের কি পরিমাণ মৃত্তিকা মধ্যে থাকা প্রয়োজন তাহার নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া যায় না, কারণ স্থানীয় ভূমির তলাচি (Surface or ground level), মৃত্তিকার গঠন, উপকরণ প্রভৃতি এবং ফসল বিশেষের প্রয়োজন ও অভাবাদির যখন কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম বা সীমা নাই, তখন এ সম্বন্ধে সাধারণভাবে কোন কথা বলা উচিত নহে।

তলাচি ও নিম্নস্তর।—দেশ, কাল বা মৃত্তিকা নির্ব্বিশেষে সকল জমির শোষণ বা ধারণ-শক্তি মধ্যে সাম্যতা নাই এবং থাকা সম্ভব নহে। এতদবস্থায় সর্ব্বত্র এক নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। আমরা যেরূপ একেবারে শুষ্ক ধূলিবৎ মাটি চাহিনা, সেইরূপ অতিশয় সিক্ত মাটিও চাহিনা, কারণ এতদুভয়ই

কৃষিকার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। তবে এ কথা বলিয়া রাখি যে, শুষ্ক ও ঢেলাপূর্ণ ক্ষেত্রের মৃত্তিকা মধ্যে প্রভূত পরিমাণে বায়ুর সমাবেশ হয়, প্রখর রৌদ্রে উপরের মাটিত শুষ্ক হয়ই, তাহা ব্যতীত তৎসন্নিহিত নিম্নস্তর ও (Sub-soil) কঠিন হইয়া যায়। অনন্তর নিম্নস্তরের ছিদ্রপথসমূহ এতই সঙ্কুচিত হইয়া যায় যে, তাহাদিগের ভিতর দিয়া রস, বায়ু কিম্বা উত্তাপ প্রবাহিত পারে না। ঈদৃশ মাটিকে মরা-জমি ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারি না। ভূমির পৃষ্ঠদেশস্থ মাটিই যে কেবল উদ্ভিদের প্রয়োজন তাহা নহে, বরং নিম্নস্তরের মাটি অগ্রে প্রয়োজন। পৃষ্ঠস্তরের ২।৪ অঙ্গুলি মাটির মধ্যে মূলগণ কয়দিন থাকিতে পারে? স্থান পাইলে এবং মাটি কোমল হইলে মূলগণ ক্রমাগত বাড়িতে থাকে। স্থানাভাব ও মাটির কঠিনতা নিবন্ধন বৃদ্ধি থাকিতেও উদ্ভিদগণ মড়াঞ্চে দশা প্রাপ্ত হয়। আমরা ইহা প্রত্যক্ষ লক্ষ্য করিয়াছি যে, যতকাল উদ্ভিদ জীবিত থাকে ততদিন বৃদ্ধি পায়, তবে সাময়িক আবহাওয়া ও উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির গতি কালভেদে হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়। মূলগণের প্রথম-বৃদ্ধি শেষ হইলে কর্ষিত-মাটি ভেদ করিয়া তাহারা নিম্নস্তরে প্রবেশ করিতে থাকে। অতঃপর সেইখান হইতেই সমধিক আহারীয় সংগ্রহ করে। এইজন্য পৃষ্ঠস্তরের মাটির যেরূপ পরিচর্য্যা করিতে হয়, তন্নিম্নস্তরে যাহাতে বায়বাদি প্রবেশ করিতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য। ভূগর্ভ মধ্যে ধীরভাবে যত অধিক বায়ু প্রবিষ্ট হইতে পারিবে, ততই ভূগর্ভ মধ্যে যবক্ষারজান প্রবেশলাভ করিতে সক্ষম হইবে এবং ভূগর্ভের জীবাণুগণ (Bacteria) স্বকীয় খাদ্য—যবক্ষার-

জান পাইয়া আহরণ করতঃ মৃত্তিকান্তর্গত তাবৎ গুরু-লঘু পদার্থকে বিশ্লেষিত করিতে থাকে। মাটির মধ্যে বায়ুর পথ যে পরিমাণে রুদ্ধ হয়, জীবাণুগণের ক্রিয়াও সেই পরিমাণে লাঘব হয়। আবার ভূপৃষ্ঠ একবারে কঠিন হইয়া গেলে নিম্নস্তরে ও উদ্ভিদের মূলসন্নিধানে যে কিছু জীবাণু থাকে তাহারাও বিলুপ্ত হয়।

ভিজে মাটি।—অতিশয় শুষ্ক মাটির যেরূপ নানা দোষ আছে, ভিজে মাটিরও সেইরূপ অনেক দোষ থাকে, কারণ ভিজে, ডোবা, কাদা মাটিতে বায়ু অতি অল্পই প্রবেশ করে এবং অনেক সময়ে আদৌ প্রবেশ করিতে পারে না। বাতাসের প্রাধান্য হইলে তাহার দাপটে ও মাধ্যাকর্ষণযোগে ভূগর্ভের রস অন্তরতম দেশে নামিয়া যায় এবং নামিবার পথে সুযোগ পাইলে পার্শ্বদেশ দিয়া চোয়াইয়া নির্গত হইয়া যায়। চোয়ানের (Percolation) মূল কারণই বাতাসের ভার। যথাকার মৃত্তিকাদোষে রস নামিয়া যাইতে পারে না অথবা চোয়াইয়া পার্শ্বদেশ দিয়াও নির্গত হইতে পারে না, তথায় বৃষ্টির জল, হয় সঞ্চিত হইয়া থাকে, কিম্বা পৃষ্ঠদেশ (Surface) বাহিয়া ক্ষেত্রান্তরে বা অন্যত্র বহির্গত হইয়া যায়। মাটির রকমভেদে ভূগর্ভে রসের অল্পাধিক্য হইয়া থাকে। এঁটেল ও রাঙ্গা মাটিতে সচরাচর অধিক রস থাকে কারণ উহার শোষণ ও ধারণশক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কিন্তু শোষকতার গতি নিতান্ত ধীর বলিয়া ক্ষেত্রমধ্যে জল পড়িবামাত্র শোষিত না হইয়া ক্ষণকাল সঞ্চিত থাকে, এই নিমিত্ত স্থানীয় মাটি নিতান্ত পঙ্কবৎ হয়। অতঃপর তদবস্থায় সেখানে লোকজন বা গবাদি পশুর চলাচল হইলে,

পদভরে জমির বহুস্থান দৃঢ় হইয়া যায়, ফলতঃ বর্ষায় সে সকল স্থানে আরও অধিক জল দাঁড়ায়। এই সকল দুর্ব্বিপাক হইতে সাবধান থাকিবার জন্য মাটির পৃষ্ঠভাগ চাদরিত (Mulch) করিয়া রাখা উচিত। এই উপায়ে জমির সিক্ততা ও শৈত্যতা বিদূরিত হয়।

ভূগর্ভের থালি।—ক্ষেত্রাদি কর্ষণ করিলে বিচলিত মৃত্তিকাস্তরের নিম্নে যে সমতল স্তর পাওয়া যায়, তাহাকে থালি নামে অভিহিত করিলে অন্যায় হয় না। কর্ষণের তারতম্যে উক্ত থালি (disc) ভূপৃষ্ঠের অল্প বা অধিক নিম্নে উৎপন্ন হয়। উক্ত থালিকে উদ্ভিদমূলের আশ্রয়স্থান বলিলেও চলে, কারণ মূল-সমূহ যথানিয়মে বর্দ্ধিত হইয়া ঐখানেই আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই থালি বা বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি কঠিন্ হইলে মূলগণ আর নিম্নদেশে অগ্রসর হইতে না পারিয়া, এদিক-সেদিক প্রসারিত হইবার চেষ্টা পায়, কিন্তু নিম্নদেশে প্রসারিত হইতে না পারিলে পার্শ্বদেশেই প্রসারিত হইবে, ইহা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। অনন্তর উক্ত থালিপৃষ্ঠ কোমল ও রসশোষণক্ষম হইলে উপরিভাগের উদ্বৃত্ত জল তাহাতে শোষিত হইয়া নিম্নদেশে নামিতে পারে, এবং সেই সঙ্গে অতিশয় সূক্ষ্ম সারও সেই থালিতে গিয়া স্থান পায়। গভীর কর্ষণ দ্বারা সেই সঞ্চিত সারকে পুনরায় উপরিভাগে আনয়ন করিতে হয়।

উত্তাপ।—বায়ু বা জল-অসম্পর্কিত ভূমি কখনই উর্ব্বরা হয় না, কারণ এতদুভয়ের অবিদ্যমানে বা একের বিদ্যমানে কোন কাজই হয় না। মৃত্তিকাকে উদ্ভিদের আহরণোপযোগী করিতে হইলে ভূগর্ভ মধ্যে যথাপরিমাণে বায়ু ও রস প্রবেশের পথ

সরল করিয়া দিতে হইবে। বায়ু প্রবেশের পথ যে পরিমাণে সরল থাকে, সূর্য্যের উত্তাপও সেই পরিমাণে ভূগর্ভে প্রবেশ করে ও তদনুপাতে বিগলনাদি ক্রিয়ার সহায়ক হয়। বাহিরের উত্তাপ বায়ুস্কন্ধে চাপিয়া পরিভ্রমণ করে। যথায় বায়ুর প্রবেশাধিকার নাই তথায় উত্তাপেরও স্থান নাই। এস্থলে অনেকের মনে সন্দিহান হইতে পারে যে, পিতল, কাঁসা, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ঘন দৃঢ় ধাতু মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না, অথচ তাহারা রৌদ্রে উত্তপ্ত হয় কেন? ইহা আদৌ গুরুতর কথা নহে। উল্লিখিত ধাতুগণ যতই কঠিন পদার্থ হউক, উহাদিগের মধ্যে বায়ু বা রস প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় না বটে, তথাপি যে উহারা উত্তপ্ত হয় তাহার কারণ এই যে, ধাতবীয় তাবৎ কণারই উত্তাপ বাহিকা শক্তি আছে এবং সেই শক্তিবলে কণাপরম্পরা দ্বারা সৌর শক্তি বা উত্তাপ সমগ্র কণা-সমষ্টিকে উত্তপ্ত করে। মৃত্তিকার উপাদান মধ্যে বিবিধ প্রকার ধাতবীয় পদার্থ থাকে বলিয়া মৃত্তিকা উত্তাপ ধারণ করিতে সমর্থ হয় নতুবা উত্তাপ প্রত্যাখ্যাত হয়।

গলনের করণ।—বিগলন কার্য্যের সহায়ক—রস, বায়ু ও উত্তাপ। উক্ত তিন পদার্থের যে কোন দুইটী বা একটীকে প্রবেশাধিকার না দিলে বিগলন কার্য্য (Disintegration) ফলপ্রদ হয় না। একটী দৃষ্টান্ত দিই। অনেক স্থানে দেখিয়াছি, লোকে সার প্রস্তুত করিবার জন্য স্থানীয় পাতা-লতা বা গোময় প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া একটী গর্ত্ত মধ্যে রাখিয়া দুই চারি ইঞ্চ বা ততোধিক মাটি দ্বারা ঢাকিয়া দেয়। এতদবস্থায় গর্ত্তমধ্যস্থ আবর্জ্জনারাশি প্রাকৃতিক নিয়মে অল্পাধিক চাপিয়া যায়। পরে

বর্ষায় উপরে জল সঞ্চিত হয় কিম্বা সেই জল গর্ত্তমধ্যে নামিয়া যায়। পাঁচ ছয় মাস পরে যখন সেই আবর্জ্জনাকে উত্তোলন করা যায়, তখন দেখা যায় যে, সেই সকল আবর্জ্জনা বিগলিত না হইয়া তদবস্থাতেই আছে কিম্বা জল কাদায় কিম্ভূতকিমাকার অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, লেখকও প্রথমাবস্থায় এই প্রণালীতে সার প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিতেন কিন্তু ক্রমে বুঝিলেন যে, সে প্রণালী ঠিক নহে। গলনীয় পদার্থকে গর্ত্তমধ্যে রাখিয়া অনাবৃত থাকিতে দিলে কালের জীর্ণী-করণশক্তি প্রভাবে আবর্জ্জনারাশি শীঘ্র বিগলিত হইয়া যায়। এতদ্দ্বারা আরও দেখা যায় যে, উপরিভাগের পদার্থ সমধিক আলোক, রৌদ্র ও বায়ুর অধীন বলিয়া শুষ্ক হইয়া যায়, তাহাতে রসের অভাব থাকে, ফলতঃ তাদৃশ ভাবে কিম্বা আদৌ বিগলিত না হইয়া অল্পাধিক চূর্ণোপযোগী হয়। অনন্তর সর্ব্ব নিম্নভাগস্থ আবর্জ্জনা রাশির কোনই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে দেখা যায় না। কেবল মধ্যভাগস্থিত আবর্জ্জনাই অল্লাধিক বিগলিত হইয়া ব্যবহারোপযোগী হয় মাত্র। এত কথার সার ও সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, রস, বায়ু, রৌদ্র ও আলোকের সমাবেশ ব্যতীত কোন পদার্থ সুচারুরূপে বিগলিত ও বিশ্লেষিত হয় না। জলে নিমজ্জিত থাকিলে কিম্বা রৌদ্রে বিস্তৃত থাকিলে অথবা বায়ুতে প্রসারিত থাকিলে কোন দ্রব্য গলে না। কোন কাষ্ঠ বা বংশ খণ্ডকে কেবল জলে বা রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিলে কিম্বা ভূগর্ভে পুতিয়া রাখিলে তাহা বিগলিত হইতে বহুকাল বিলম্ব হয়। রৌদ্র ও বৃষ্টি পায়, এরূপ স্থানে ফেলিয়া রাখিলে অতি অল্পকাল মধ্যে গলিয়া যায়। ঘর-বাড়ী নির্ম্মাণার্থে অথবা কূপ পুষ্করিণী খনন-

কালে অনেক স্থানের গভীর ভূগর্ভ হইতে মানুষের হাড় পাওয়া যায়। এইরূপ বায়বাদি রুদ্ধ স্থানে থাকিবার হেতু শতাধিক বৎসরের অস্থির কোন বৈলক্ষণ্য হইতে দেখা যায় না, কিন্তু মাঠে-ঘাটে পতিত থাকিলে রৌদ্রবৃষ্টি প্রভৃতির প্রভাবে অনেক শীঘ্র জীর্ণ হইয়া যায়। অনেক প্রাচীন অট্টালিকার ভিত্তির নিম্নে বাহাদুরী কাষ্ঠ প্রোথিত থাকে। শতবৎসর পরে উঠাইলে দেখা যায় যে, কাষ্ঠের কোন বৈলক্ষণ্য হয় নাই কিন্তু কোন কোন স্থানে কিছু বিকৃত হয়। কালবিলম্বেও যে বিকৃত বা বিগলিত হয়, তাহারও কারণ এই যে, কালবিলম্ব সহকারে কোন না কোন ক্রমে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে উহাতে উক্ত পদার্থত্রয়ের অল্পে অল্পে সমাবেশ হয় এবং তাহারই ফলে বিগলন ক্রিয়ার কার্য্য চলিতে থাকে।

উর্ব্বরতা।—ভূমিতে একটী বিশেষ অদ্রষ্টব্য জিনিষ আছে এবং তাহাকে উদ্দীপিত করাই কর্ষণের মুখ্য উদ্দেশ্য। উক্ত অদ্রষ্টব্য গুণবাচক জিনিসের নাম,—উর্ব্বরতা। ভূমি যেরূপ উপাদান-উপকরণে গঠিত হউক, সকল প্রকার ভূমিরই উর্ব্বরতা আছে, কাহারও অধিক, কাহারও কম। সেই উর্ব্বরতাকে সঞ্জীবিত বা উদ্দীপিত করিবার জন্যই আমাদিগকে এত প্রয়াস পাইতে হয়। উক্ত শক্তি বা গুণ দুই ভাগে বিভক্ত,—আশু ও ভাবী।

আশু-উর্ব্বরতা।—কালক্রমে, কর্ষণফলে ও আনুসঙ্গিক নানা কারণে ভূগর্ভস্থ পদার্থ রাশি নিরন্তর রূপান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। ইহাই প্রকৃতির ধর্ম্ম। সচরাচর সদ্য-প্রাপ্য উর্ব্বরতাকে কাজে নিয়োজিত করিবার নিমিত্ত ভূমি কর্ষিত হইয়া থাকে। ভূপৃষ্ঠকে

কর্ষণ করিয়া তাহার জড়তা ভাঙ্গিয়া দেওয়া এবং তন্নিম্নস্থ মাটিকে কার্য্যোপযোগী করিয়া লওয়া—এই দুইটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া লোকে চাষ করিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাহা নহে, ভূমির অন্তর্নিহিত উর্ব্বরতাকে কার্য্যের উপযোগী করিয়া না লইলে কর্ষণের তাবৎ উদ্দেশ্য সফল হয় না। আবাদোপযোগী—উত্তমরূপে—কর্ষণাদি করিবার পর যদি উক্ত কর্ষিত ভূমিকে এরূপ দৃঢ়ভাবে আবরিত করিয়া রাখা যায় যে, তাহাতে কোন মতে বায়ুবাদি প্রবেশ করিতে না পারে, তাহা হইলে কর্ষণের কোন উদ্দেশ্য সফল হয় না। বর্ত্তমান প্রণালীমত কর্ষণাদি দ্বারা আমরা কেবল ভূপৃষ্ঠের মাত্র ক্ষীণ স্তরকে অল্পাধিক বিচলিত করিয়া লই এবং সেই সঙ্কীর্ণ স্তর মধ্যে যে সামান্য উর্ব্বরতা উদ্দীপিত হয় তাহাই ফসলের আশু কাজে আসে। তন্নিম্নস্তরে যে রাশি রাশি উর্ব্বরতা বিদ্যমান রহিয়াছে তাহার আদৌ ব্যবহার করিবার আমরা কোন চেষ্টা করি না। এইজন্য বারম্বার আবাদফলে ভূপৃষ্ঠভাগস্থিত ক্ষীণস্তর শীঘ্র শক্তিহীন হইয়া পড়ে। সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, ভূগর্ভ মধ্যে আরও উর্ব্বরতা নিরন্তর বিদ্যমান রহিয়াছে, মাত্র আমাদিগের চেষ্টাহীনতাহেতু তাহার কোন ব্যবহার হইতেছে না। চারি, পাঁচ বা ছয় অঙ্গুলি-স্তর কর্ষণে যে উর্ব্বরতাকে আমরা আয়ত্তাধীন করিতে পারি, দশ বা বারো অঙ্গুলি গভীর-স্তর কর্ষণ করিলে যে আরও ২।৪ গুণ উর্ব্বরতাকে কার্য্যে নিয়োজিত করিতে সমর্থ হই এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ ২।৪ গুণ উৎকৃষ্ট ফসল একই পরিমিত স্থান হইতে আহরণ করিতে পারি তাহা বিশেষরূপে স্মরণ রাখা উচিত। আপাততঃ ব্যবহারের জন্য

পৃষ্ঠের বা তলাচির ক্ষীণস্তরকে কর্ষণ করিলে চলিবে না, প্রচ্ছন্ন উর্ব্বরতাকেও কার্য্যোপযোগী করিতে হইবে, কারণ তাহা হইলে ৫।৬ মণ স্থলে ১০।১৫ মণ বা ততোধিক ফসল উৎপন্ন হইবে, ইহা অধিক কথা নহে।

ভাবী উর্ব্বরতার মূল।—শিকড়সমূহ গভীর মৃত্তিকা মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে মূলগণ প্রসারিত হইবার যথেষ্ট স্থান পায়, মূলের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়, ফলতঃ মূলগণ সমূহ পরিমাণে রস ও খাদ্য দ্রব্য আহরণ করিয়া এক একটী সুন্দর উদ্ভিদে পরিণত হয়। ঘন করিয়া বীজ বা গাছ রোপিত হইলে স্থানাভাব হেতু উদ্ভিদগণ সুচারুরূপে বর্দ্ধিত বা সুপল্লবিত হইতে পারে না—ইহা আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাইতেছি। সেইরূপ, ভূগর্ভ মধ্যে যথেষ্ট স্থান না পাইলে মূলগণ সচ্ছন্দে প্রসারিত হইতে না পারিয়া পরস্পরের মূল ঘনভাবে বিজড়িত হইয়া পড়ে, সকলেরই বৃদ্ধির ব্যাঘাত হয়, কিন্তু যথেষ্ট স্থান পাইলে মূলগণ অনায়াসে বাড়িতে পারে। মূলের সংখ্যা, দৈর্ঘ্য ও স্থূলতা যত বৃদ্ধি পায় ততই তাহাদিগের আহরণ-শক্তি বৃদ্ধি পায়। আহরণ-শক্তি বৃদ্ধি পাইলে অধিক আহার্য্য আহরিত হয়, সুতরাং উদ্ভিদও তদনুরূপ বৃদ্ধিশীল হয়। সঙ্কীর্ণ স্থান মধ্যে থাকিতে হইলে উদ্ভিদগণ যে ক্লেশ পায় তাহা বুঝিতে পারা যায়। কোন একটী বহুদিন পূর্ব্বে রোপিত গামলার গাছকে সাবধানে সমগ্র মাটি সমেত গামলা হইতে স্বতন্ত্র করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গাছের তাবৎ শিকড়গুলি কিরূপ ঘনভাবে সমগ্র মাটিকে জড়াইয়া আছে। প্রকৃতপক্ষে উহারা যে কেবল মাটিকে জড়াইয়া থাকে তাহা নহে। স্থানাভাবপ্রযুক্ত প্রসারিত হইতে না পারিয়া যেন আবদ্ধ স্থান হইতে

বহির্গত হইবার জন্য মূলগণ গামলার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল—ইহাই মনে হয়। এক্ষণে উক্ত গাছটীকে জমিতে রোপণ করিলে মূলগণ চারিদিকে ধাবিত হইতে থাকিবে।

গভীর কর্ষণে ও পৃষ্ঠদেশের ২।৩ অঙ্গুলি মাটি সুচূর্ণীত অবস্থায় থাকিলে ফসলের আদৌ রসাভাব হয় না। ভারতের ন্যায় দেব-মাতৃকদেশে সামান্য অনাবৃষ্টিতে প্রতিবৎসর কোন-না-কোন প্রদেশে বা জেলায় অনটন বা অন্নক্লেশ সংঘটিত হইতেছে। ইহার প্রতীকারকল্পে ক্ষেত্রের উৎপাদিকাশক্তিকে পূর্ণমাত্রায় খাটাইয়া লওয়া একান্ত কর্ত্তব্য হইয়াছে। **আমাদিগের ভূমি নিঃস্ব হয় নাই—আমাদিগের উদ্যমহীনতা দোষবশতঃ ফলন কমিতেছে এবং দিন দিন কমিবে।**

ভূগর্ভ কিসে এত উদ্ভিদখাদ্যে পূর্ণ তাহা মৎকৃত 'মৃত্তিকা-তত্ত্ব' নামক পুস্তকে বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে বলিয়া তৎসম্বন্ধে এস্থলে সমধিক আলোচনা না করিয়া সংক্ষেপে এই মাত্র বলিব যে, প্রতিবৎসর এবং প্রতিবার বারিপাত হইলে, ভূপৃষ্ঠভাগের রাশি রাশি—গলনীয় ও অগলনীয়, জৈব ও অজৈব—পদার্থ নিম্নদেশে নামিয়া যায়, কিন্তু সুকর্ষণের অভাবে উদ্ভিদের মূলগণ ততদূর নিম্নে পৌঁছিতে পারে না, কিম্বা অতি কষ্টে পৌঁছিবার পূর্ব্বে তাহা-দিগের আয়ুঃ শেষ হইয়া আসে, ফলতঃ সেই বহুকালার্জ্জিত সার-রাশি ভূগর্ভের নিম্নস্তরে থাকিয়া যায়। ধরিত্রীগর্ভ সারপূর্ণ হইলেও উর্ব্বরতা—মৃত্তিকা বা সারের কোন উপকরণ নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, উহা একটী গুণবাচক পদার্থ,—স্থূল সামগ্রী নহে।

ভাবী-উর্ব্বরতা।—আশু উপকারের জন্য ভূপৃষ্ঠভাগের ক্ষীণস্তরকে কার্য্যকরী করিয়া লওয়া যেরূপ প্রয়োজন, ফসলের ভাবী

উপকারের জন্য নিম্নস্তরের মাটিকে সর্ব্বদা ভাল অবস্থায় রাখা সেই-রূপ প্রয়োজন। মোটামোটি আমাদিগের জানা আছে, কোন্ ফসলের জন্য কতটা গভীর মাটির প্রয়োজন কিন্তু ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি না যে, বর্ত্তমান আবহাওয়াদির গুণে বা দোষে কোন্ ফসল কিরূপ বৃদ্ধিশীল হইবে, কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হওয়া উচিত বলিয়া ভাবী-উর্ব্বরতাকে স্বীয় আয়ত্তমধ্যে রাখা কর্ত্তব্য। ক্ষেত্রের ভাবী-উর্ব্বরতা সদাই যাহাতে প্রস্তুত থাকে তাহা করিতে পারিলে লাভ ব্যতীত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। ফসলের বৃদ্ধিকালে বারিপাত থামিয়া গেলে, কিম্বা ভূমির নিম্নস্তর অপ্রকৃতাবস্থায় থাকিলে, মূলগণ আর নিম্নে নামিতে না পারিয়া রস ও খাদ্যের অভাবে কষ্ট পাইবে, তন্নিবন্ধন যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবে। ভূমিতে সার বিদ্যমান থাকিলেই যে, তাহাকে উর্ব্বরা ভূমি বলিতে হইবে তাহা নহে, কিম্বা ভূমিতে সারপ্রদান করিলেই যে তাহা উর্ব্বরা হইয়া উঠিল, তাহাও নহে। সকল পদার্থেরই কোন-না-কোন গুণ থাকে, কিন্তু তাহা যে সকল সময়েই কার্য্যকরী অবস্থায় থাকে, তাহা নহে। কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ সূত্রে উক্ত দ্রব্যান্তর্গত আপাতপ্রচ্ছন্নগুণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়, তখনই আমরা উহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। ভূমির উর্ব্বরতা মৃত্তিকাকণামধ্যে, কি সারমধ্যে, অবস্থান করে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, তবে আমরা ইতঃপূর্ব্বে জানিয়াছি যে, সকল দ্রব্যের মধ্যেই একটী গুণ বিদ্যমান থাকে এবং কার্য্য-কারণ ফলে তাহার বিকাশ হয়। এস্থলে কার্য্যকারণাদি কি, তাহাই আমরা দেখিব।

ক্ষেত্রে উর্ব্বরতা আনয়ন করিবার জন্য ভূকর্ষণ ও মৃত্তিকা-চূর্ণ করিতে হয়। অতঃপর মৃত্তিকাকণাগণের সহিত বায়ু, রস,

রৌদ্র, শিশির, আলোক প্রভৃতির সংযোগ হইলে ভূগর্ভ মধ্যে একটী ভৌতিক ক্রিয়ার সমাবেশ হয়। অতঃপর এতৎ সমুদায়ের,—মৃত্তিকা, রস, বায়ু প্রভৃতির—যৌথ ক্রিয়াগুণে সেই গুণবাচক পদার্থের উদ্ভব হয়। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, উক্ত পদার্থ সমূহের সমবেত কার্য্যফল—উর্ব্বরতা। উত্তম সারাল জমি যেমন একদিকে উর্ব্বরা হইতে পারে, অন্যদিকে তথাকথিত অনুর্ব্বরা ক্ষেত্রও আনুকুল্যাবস্থায় পড়িলে শস্যশালিনী হইতে পারে, সুতরাং উভয়ক্ষেত্রেই আমাদিগের বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। মাটি, কর্ষিত হইলেই, কর্ষণের তারতম্যানুসারে অল্পাধিক উর্ব্বরতা লাভ করে, তদ্দ্বারা আশু উপকার দর্শে, কিন্তু তাহা সমধিক বা দীর্ঘকালস্থায়ী নহে বলিয়া ফসলের তাদৃশ শ্রীবৃদ্ধি হয় না। প্রচ্ছন্ন-উর্ব্বরতা ক্ষেত্রমধ্যে বিদ্যমান থাকে। তাহাকে কার্য্যকরী করিয়া লওয়া এবং তাহার পরিবর্দ্ধন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এরূপ করিলে কৃষির বর্ত্তমান অবস্থা তড়িতবেগে পরিবর্ত্তিত হইয়া বহুগুণ ফসল উৎপন্ন হইবে—ইহা দুরাশা নহে। কোন এক কিতা সমভাব ও সমগুণ জমিকে দুইখণ্ডে বিভক্ত করিয়া একখণ্ডকে উত্তমরূপে ও গভীররূপে চাষ দিয়া এবং অপর খণ্ডকে প্রচলিত পদ্ধতিমত সাধারণভাবে চাষ দিয়া, কোন একটী ফসলের আবাদ করিলে অতি সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, প্রথমখণ্ডজাত ফসল কত বৃদ্ধিশীল, কত তেজাল, কত ফলপ্রদ, আর শেষোক্ত খণ্ডের ফসল কত দীন, কত শীর্ণ এবং কত অল্প ও কত নিকৃষ্ট ফসল প্রদান করে! এ সম্বন্ধে আমেরিকা-যুক্ত-প্রদেশস্থ কর্ণেল-বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ কৃষিবিদ্ বেলী সাহেব বহু পরীক্ষা, বহু গবেষণা ও দীর্ঘকাল আলোচনার পর

কি বলেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

"The texture or physical condition of the soil is nearly always more important than its mere richness in plant food."

সুকর্ষিত ও উত্তমরূপে চূর্ণীত ঝুরা মাটিতে, কঠিন ঢেলা-বিশিষ্ট জমি অপেক্ষা কেন ভাল ফসল জন্মে তাহার ব্যাখ্যা হেতু পুনরায় বলেন—

"It (সুকর্ষিত ও সুচূর্ণীত ভূমি) holds and retains more moisture; holds more air; presents greater surface to the roots; promotes nitrification; hastens the decomposition of the mineral elements; has less variable extremes of temperature; allows a better root-hold to the plant."

আমরা হাতে-হাতিয়ারে কার্য্যক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ব্যাপৃত থাকিয়া ইহাই বুঝিয়াছি এবং এই জন্য ক্ষেত্রে সার প্রদান অপেক্ষা সুকর্ষণেরই নিতান্ত পক্ষপাতী। উল্লিখিত অবস্থাপন্ন মাটিতে সার সংযোজিত হইলে 'সোনায় সোহাগা' হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু অবহেলাকৃত জমিতে যতই সার প্রদত্ত হউক, তাহাতে কোন ফল হয় না, মাত্র পণ্ডশ্রম ও অর্থ নষ্ট হয়। আমরা এরূপ অভিযোগ প্রায়ই শুনিয়া থাকি যে 'বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, জনমজুর খাটাইয়া আশানুরূপ ফল পাইলাম না।' তাহার কারণ কি, এক্ষণে কি আর তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে? বেলী সাহেব অন্য একস্থলে বলিয়াছেন—

"It is useless to apply commercial fertilizer

to lands which are not in proper physical condition for the very best growth of crops."

পৃষ্ঠভূমি আলগা ও চূর্ণ থাকিলে বৃষ্টির অভাবে ক্ষতি হয় না। আমরা প্রতিনিয়ত দেখিয়া আসিতেছি যে, হাল, চৌকী প্রভৃতি দ্বারা ভূমি উত্তমরূপে কর্ষিত হইল, বীজ বপিত হইল, যথাক্রমে ক্ষেত্রব্যাপিয়া চারা জন্মিল এবং দিন দিন ক্ষেত্র ও ফসল মনোহর রূপ ধারণ করিতে লাগিল। এ সমুদায় দেখিয়া কৃষকের প্রাণ আহ্লাদে ও আশায় পূর্ণ হইতে লাগিল। এ অবস্থায় কৃষকের যে আনন্দ তাহা বলিয়া বা লিখিয়া ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। যাহা হউক, এই সময়ে যখন গাছগুলি সুন্দর বাড়িতেছে, এক পসলা বৃষ্টি হইলে কি হয়? বৃষ্টির অব্যবহিত পরে অর্থাৎ দুই-পাঁচ দিন মধ্যে তাবৎ গাছেরই যেন অল্লাধিক্ক শ্রীবৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। অতঃপর যত রস শুকাইতে থাকে, ভূপৃষ্ট তত কঠিন হইতে কঠিনতর হইতে থাকে। বৃষ্টির পূর্ব্বে মাটি যেরূপ ঝুরা ও হালকা ছিল, যেরূপ কোমল ও স্থিতিস্থাপক ছিল, এক্ষণে আর তাহা থাকে না। অনন্তর সূর্য্যের কিরণসম্পাতে একদিকে রস শুকাইতে থাকে, অন্যদিকে ভূগর্ভস্থরস উর্দ্ধগামী হইবার কালে মাগ্নেসিয়া, চূণ, লবণ প্রভৃতি মৃত্তিকান্তর্গত ধাতবীয় সূক্ষ্ম পদার্থ সমূহকে পৃষ্ঠদেশে আনয়ন করিয়া মাটির ছিদ্রপথসমূহকে রুদ্ধ করিয়া দেয়, ফলতঃ মাটির মধ্যে আর বাতাস প্রবেশ করিতে পারে না, ভূগর্ভ হইতে রসও উপরে উঠিতে পারে না, তন্নিবন্ধন অর্থাৎ বায়ু ও রসাভাবে সেই সুন্দর মনোহর উদ্ভিদ সকল ম্রিয়মান হইয়া পড়ে, পত্রাদি বিবর্ণ হইয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় কয়েকদিন থাকিলে তাবৎ ফসলই বিনষ্ট হয়।

হৈমান্তিক ও রবি ফসলে এরূপ দুর্ঘটনা প্রতিবৎসরই প্রায় সংঘটিত হয়। উক্ত ফসলের বীজ বপনের পর চারা উদ্গত হইলে মধ্যে মধ্যে যদি বৃষ্টি হয় তাহা হইলে ফসলের বিশেষ উপকার হয়, এই প্রাচীন ধারণা হেতু লোকে তৎকালে বৃষ্টি প্রার্থনা করে এবং বারিপাত হইলে আনন্দ প্রকাশ করে! উক্ত ধারণা মধ্যে কতক সত্য ও কতক ভ্রম নিহিত আছে। বৃষ্টির জলে ফসলের উপকার হয়, ইহা অব্যর্থ সত্য, কিন্তু সত্যকে সত্যে পরিণত করিতে হইলে কৃষককে তৎপরতা সহকারে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। এতদবস্থায় বৃষ্টির পর মাটিতে যো পাইবামাত্র কালবিলম্ব না করিয়া ক্ষেত্রোপরি উত্তমরূপে বিদে পরিচালনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ বিদে পরিচালনা দ্বারা ভূপৃষ্ঠের ২।৩ অঙ্গুলি নিম্নের মাটি আল্‌গা ও ঝুরা হয়। ঈদৃশ পরিচর্য্যা ফলে ভূগর্ভ মধ্যে পুনরায় বায়ু ও উত্তাপ প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়, ছিদ্রপথ সমূহ ক্রিয়াশীল হয়, অতঃপর ভূগর্ভমধ্যে পূর্ব্ববৎ ভৌতিক ক্রিয়ার সমাবেশ হয়। বরং বারিপাত হেতু মৃত্তিকা সরস হওয়ায় ভৌতিক ক্রিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়, ফলতঃ জীবাণুর সংখ্যা ও ক্রিয়াশীলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া নাইট্রেট নামক লাবণিক উদ্ভিদাহার সৃষ্টির সুবিধা হয়। পরিতাপের বিষয় এই যে, কৃষকগণ এ সকলের কিছুই করে না, কাজেই মাটি দৃঢ় হইয়া যায়, গাছ মরিয়া যায়। বৃষ্টি না হইলে বরং ফসল হয়, কিন্তু বৃষ্টির পর উপরোক্ত পরিচর্য্যা না হইলে সমূহ ক্ষতি হয়। রবি ফসলকালে বৃষ্টির অতি কম সম্ভাবনা এবং যে কিছু হয়, তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী বা ঘন ঘন না হইয়া অল্প দুই এক পশলা হয় মাত্র। এতদবস্থায় কৃষকগণ যে, ফসল রক্ষা করিতে পারে না ইহাই আশ্চর্য্যের ও পরিতাপের বিষয়।

ধান্যের আবাদই এ দেশের,—বিশেষতঃ নিম্ন বঙ্গ, আসাম প্রভৃতি সমতল ও বৃষ্টিবহুল দেশের প্রধান ফসল। উক্ত ফসল সমূহের আবাদকালে প্রভূত বারিপাত হয় বলিয়া ভূমি জমাট বাঁধিতে পারে না, তাহাতেই যাহাহউক ধান্য জন্মে, কিন্তু তাহা হইলেও বৎসর ও দেশ বিশেষে প্রায় কোন-না-কোন প্রদেশ বা জেলায় বৃষ্টির অল্পাধিক অভাব হইলে অন্নাভাব বা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় কিন্তু উল্লিখিত প্রণালীতে ক্ষেত্রের পরিচর্য্যা করিতে পারিলে দেশের মধ্যে একবারে দুর্ভিক্ষ হইতে পারে না। ধান্য, মাড়ুয়া, ভুট্টা, চিনে প্রভৃতি বর্ষাতি ফসল, কিন্তু গোধূম, ডাল কলাই, তিসি, সর্ষপ প্রভৃতি রবি ফসল। শেষোক্ত ফসলগণ অতিশয় অবহেলা প্রাপ্ত হয়। আমন ও ভাদুই ফসল সংগৃহিত হইবার বহুপরে ক্ষেত্র তৈয়ার করিয়া তবে রবি ফসলের স্থান করিতে হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী ফসল সংগৃহিত হইবার পর ভূমিকর্ষণে কালবিলম্ব হেতু মাটি জমাট বাঁধিয়া ফাটিয়া যায় এবং এতই কঠিন হইয়া যায় যে, তাহাতে ফালের ঈষ প্রবিষ্ট হইতে পারে না। এইরূপ বহু কষ্টে যে চাষ হয় তাহাতে সুকর্ষণ ত হয়ই না বরং ক্ষুদ্র বৃহৎ ঢেলায় ক্ষেত্র পূর্ণ হয় তন্নিবন্ধন মাটির রস শুকাইয়া যায় এবং ফসল আশানুরূপ বাড়িতে পারে না সুতরাং শুষ্ক-আবাদের আধুনিক প্রণালী এক্ষণ হইতে অবলম্বন করিতে না পারিলে অদূর ভবিষ্যৎ নিতান্ত তমসাচ্ছন্ন বলিয়া আমাদের ধারণা।

আমরা যদি মাত্র বাঙ্গলার—খাস বাঙ্গলাদেশের—বিষয় লইয়া আলোচনা করি, তাহা হইলেই দেখিতে পাই, জেলা পরস্পর মধ্যে মৃত্তিকা, আবহাওয়া প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তর প্রভেদ।

প্রেসিডেন্সি ডিবিজান (জেলা ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুরসিদাবাদ, যশোহর, খুলনা) ও বর্দ্ধমান ডিবিজান (মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী, বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া)—পশ্চিম বঙ্গে, কিন্তু এই দুই ডিবিজানের মাটি, বারিপাত প্রভৃতির সমূহ প্রভেদ। প্রেসিডেন্সি, ঢাকা, রাজসাহী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি কয়টী ডিবিজানে বারিপাতের পরিমাণ যত এবং মৃত্তিকার গঠন যেরূপ, বর্দ্ধমানাদি পশ্চিম বঙ্গের তাবৎ ডিবিজানে তাহা অপেক্ষা বারিপাত কম, মাটির গঠন স্বতন্ত্র ইত্যাদি। এই সকল কারণবশতঃ ভাগিরথীর পশ্চিম পার্শ্বস্থিত তাদৃশ জেলা সমূহে কর্ষণ বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক যত্নশীল হওয়া উচিত। ময়মনসিং, ঢাকা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতির মাটি লৌহ সঙ্কুল (Ferrugenous) ও কঠিন। বর্ষাকালে ঐ সকল জেলায় মাটি এত নরম, পিচ্ছিল ও কর্দ্দমাক্ত যে, তাহার উল্লেখ না করাই ভাল। অল্পদিন হইল, কোন সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারীর উদ্যানাদি পরিদর্শনার্থ ঢাকা গিয়াছিলাম। দুই চারি দিন তথায় থাকিতে থাকিতে তাঁহার উদ্যানের কয়েক স্থানে পাম্ (Palm) গাছ (Areca lutescens) রোপিত আছে—দেখিলাম। উক্ত গাছ কয়টীর দুরবস্থা দেখিয়া সন্তুষ্ট হওয়া দূরের কথা বরং বড়ই ব্যথিত হইলাম। গাছের গোড়ার মাটি বজ্রবৎ কঠিন হইয়া গিয়াছে, পত্র সমূহ বিবর্ণ ও শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এতদ্দর্শনে উদ্যান-স্বামীকে উহাদিগের দুর্দ্দশার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর করিলেন যে, সে দেশে উক্ত পাম্ গাছ জমিতে বাঁচে না। উক্ত পাম্ ও অন্যান্য আরও কয়েক জাতীয় পাম্ গামলায় আছে—কিন্তু দেখিলাম তাহাদিগের অবস্থা অতি সুন্দর—বর্ণ হরিৎ, সমূহ পত্র-সম্পন্ন ও তেজাল। অতঃপর আমার পরামর্শ মত জমির

গাছের গোড়ায় সমধিক পরিমাণে জল ঢালিয়া এক রাত্রি রাখিয়া, মাটি নরম হইলে, পর দিবস গাছগুলির গোড়া এক হাত ব্যাস বিস্তৃত ও আট অঙ্গুলি গভীর করিয়া খনন করতঃ উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর পর দিবস হইতেই সকল গাছেই সজীবতা দেখা গেল। তখন তিনি আশান্বিত হইয়া গাছগুলিকে যত্ন করিতে লাগিলেন, প্রতিদিন গাছে জল সেচন করিতে লাগিলেন ইত্যাদি। ইতঃপূর্ব্বে উক্ত গাছগুলিকে তিনি কাটিয়া ফেলিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এ দৃষ্টান্ত যথা-তথা দেখিতে পাওয়া যায়। জলসেচন না করিলে কোন গাছ সহজে মরে না কিন্তু বলা বাহুল্য যে, গোড়ার মাটি সমধিক চূর্ণিত অবস্থায় থাকা চাই। যত প্রখর রৌদ্র হউক, যত প্রবল বায়ু হউক, গাছের গোড়ার মাটি আল্‌গা ও চূর্ণ থাকিলে এবং ভূগর্ভ কোমল থাকিলে আহারাভাবে কোন উদ্ভিদ মরে না। ইহা হইতে শুষ্ক-আবাদের ফল (Dry culture) বুঝিতে পারা যায়। মৃত্তিকার এমনও একটী শক্তি আছে যদ্দ্বারা উহা বায়ুমণ্ডল হইতেও রস আহরণ করিয়া সরস থাকে। উক্তশক্তিকে Hygroscopicity কহে। ভূমি হইতে কিয়ৎপরিমাণ মাটি উঠাইয়া উত্তমরূপে চূর্ণকরতঃ একটী পাত্রে রাখিয়া উক্ত পাত্রটীকে কোন স্থানে ক্ষণকাল রাখিয়া দিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মাটির ভিতরে ঈষৎ রসের সঞ্চার হইয়াছে, তবে সে রস স্থায়ী বা অধিক নহে, কারণ একদিকে যেমন উহা আহরণ করে, অন্তদিকে রৌদ্রে শুষ্ক হইয়া যায়।

নাবাল জমি।—বর্ষাকালে তাবৎ নাবাল জমিতে জল সঞ্চিত হইয়া থাকে এবং সেই প্রকার জমিতে ধান্ত উৎপন্ন হয়।

ইতঃপূর্ব্বে অনেক স্থলে বলিয়াছি যে, জমি জলময় অবস্থায় থাকিলে ভূগর্ভ মধ্যে বায়বাদি প্রবিষ্ট হইতে পারে না। কিন্তু, উহাদিগের প্রবেশ পথ না থাকিলে মৃত্তিকায় উদ্দীপকতা কোথা হইতে আইসে? মাটিতে উত্তাপ, আলোক, বায়ু প্রভৃতির সমাবেশ না হইলে ভূগর্ভ মধ্যে জীবাণুর উদ্ভব হয় না, কিন্তু ধান্য কি প্রকারে জন্মে? ইহা একটী গুরুতর প্রশ্ন সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমরা তাহারই আলোচনা করিব। ইহা সকলেই বিদিত আছেন যে, সকল উদ্ভিদই নাইট্রোজেন আহরণ করে, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে মাত্র সিম্বীক শ্রেণীস্থ উদ্ভিদ ভিন্ন অপর সকল উদ্ভিদ প্রায় সম্বদ্ধ (combined) নাইট্রোজেন আহরণ করে, কিন্তু সিম্বীকগণ তাহা না করিয়া বায়ুমণ্ডলের অসম্বদ্ধ (Free) নাইট্রোজেন আহরণ করিতে সমর্থ। বায়ুমণ্ডলে যে নাইট্রোজেন সর্ব্বদা বিরাজমান তাহা বাতাসে ভাসমান অবস্থায় থাকে। অপর উদ্ভিদগণ ঈদৃশ অসম্বদ্ধ নাইট্রোজেন আহরণ করিতে পারে না কিন্তু উক্ত নাইট্রোজেন অপর পদার্থের সহিত সম্বদ্ধ বা সম্মিলিত হইয়া নাইট্রেট্ নামক লাবণিক পদার্থে যখন পরিণত হয়, তখন এই সকল উদ্ভিদ তাহা গ্রহণ করে। যে কোন সম্বদ্ধ নাইট্রোজেন ক্ষেত্রে প্রদত্ত হউক, তাহা মৃত্তিকান্তর্গত জীবাণুগণ দ্বারা বিশ্লিষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত উদ্ভিদ-গণের ব্যবহারে আসে না। যবক্ষারজানসম্বলিত যে কোন উদ্দীপক বা সার হউক, বিশ্লেষণের অনুপাতানুসারে তাহার গুণবত্তার তারতম্য হইয়া থাকে। যত শীঘ্র বা যত অধিক বিশ্লেষিত হয়, তত তাহা উদ্দীপক হয়। অস্থি, নখ, খুর প্রভৃতি কঠিন পদার্থ মধ্যে যে নাইট্রোজেন থাকে, তাহা হইতে নাইট্রোজেন বিমুক্তিলাভ করিতে কালবিলম্ব হয়, কিন্তু শোণিত, মাংস, বা

মূত্রপূরিষাদির অন্তঃর্গত নাইট্রোজেন অল্পকাল মধ্যে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। যাহা হউক, বিশ্লেষিত হইবার পক্ষে ভূগর্ভে অবাধ বায়ু প্রবাহের একান্ত প্রয়োজন, তদভাবে তাহাতে যবক্ষারকতার গতি নিতান্ত মন্থর হয় কিম্বা উক্ত পদার্থ আদৌ উৎপন্ন হইতে না পারিয়া আবদ্ধ থাকে। পাঠক দেখিয়া থাকিবেন যে, পোয়ালী (ধান্যের চারা) রোপণের পূর্ব্বে কৃষকগণ জলপূর্ণ ক্ষেত্রকে হল-চালনা দ্বারা মাটিকে নিতান্ত পঙ্কবৎ করিয়া লয়। জলের অভাব থাকিলে ক্ষেত্রান্তর বা নিকটস্থ খাল বিল হইতে জল আনিয়া তবে মৃত্তিকা কর্ষণ করে। ধান্যক্ষেত্রের মাটিকে ঈদৃশ অবস্থায় পরিণত করা একান্ত প্রয়োজন। মাটিকে কর্দ্দমে পরিণত করিলে উহার সছিদ্রতা দূর হয়, তন্নিবন্ধন উপরিভাগের জল চুয়াইয়া ভূমির গর্ভদেশে নামিয়া যাইতে পারে না, ফলতঃ ক্ষেত্রের উপরিভাগে জল স্থায়ী হয়। ধান্যক্ষেত্র এইরূপ জলমগ্নাবস্থায় থাকে বলিয়া তাহাতে যবক্ষারজানজনিত কোন প্রকার লবণ উৎপন্ন হইতে পারে না। আরও দেখা গিয়াছে যে, তজ্জাতীয় লবণ দ্বারা ধান্যের বিশেষ উপকার দর্শে না, সুতরাং ধান্যক্ষেত্রে সোরা প্রভৃতি লবণ ব্যবহার করায় কোন লাভ নাই। এতদর্থে য়্যামোনিয়া বিশেষ উপযোগী। নাইট্রোজেন-সম্ভূত পদার্থ হইতে য়্যামোনিয়ারও উৎপত্তি, কিন্তু তাহা বাষ্পীয় (Gaseous) পদার্থ। রাসায়নিক বা ভৌতিক ক্রিয়া বলে তরল পদার্থে পরিণত হয়, কিন্তু তাহা হইলেও উক্ত য়্যামোনিয়া কোন পদার্থের সহিত দৃঢ়ভাবে সম্বদ্ধ হয় না, সুতরাং সহজেই উদ্ভিদগণ আহরণ করিতে সমর্থ হয়। এই সকল কারণে নাবাল বা ধান-জমিতে য়্যামোনিয়া সহজে ও শীঘ্র উৎপন্ন হয়। আশু বা ষাটী ধান্য ডাঙ্গা জমিতে জন্মে এবং সে সকল জমিতে

নাইট্রেট্ লবণ উৎপন্ন হয়, আর সেই সকল ধান্যক্ষেত্রে জল সেচনের ব্যবস্থা থাকিলে তাহাতে উল্লিখিত লবণ (Nitrate of Soda, Nitrate of Sulphur, Nitrate of Potash)—ব্যবহার করা চলিতে পারে এবং তদ্দ্বারা ফসলেও উপকার দর্শিয়া থাকে।

নাবাল জমিতে বর্ষাকালে একদিকে যেমন নাইট্রোজেনজনিত লবণ উৎপন্ন হইবার পক্ষে নানা প্রতিবন্ধক পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ অন্যদিকে তাহাতে প্রভূত পরিমাণে য়্যামোনিয়া উৎপন্ন হইয়া তজ্জাত উদ্ভিদগণের নাইট্রোজেনের অভাব দূর করে। আরও বিশেষ কথা এই যে, সেই সকল ফসলই লবণ অপেক্ষা য়্যামোনিয়া দ্বারা উপকার পায়।

জলপূর্ণ বা ডোবা ভূমিতে এই জন্য গভীর কর্ষণের কোন প্রয়োজন হয় না, বরং এতদ্দ্বারা সমূহ ক্ষতিই হইয়া থাকে। এজন্য বর্ষাকালের তাবৎ ফসলের জন্য অতি গভীর কর্ষণ না করিয়া চলিত পদ্ধতি অনুসারে ঈষৎ বিবেচনাসহকারে কর্ষণ করিতে হইবে, কিন্তু তাহা হইলেও তৎপরবর্ত্তী যত পরিচর্য্যা—মৃত্তিকাচূর্ণন, জল নিকাশ, জলরোধ প্রভৃতি কার্য্য—সম্বন্ধে ঔদাস্য করা উচিত নহে। গভীর কর্ষণের যাবতীয় দিক পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া অনেকে ধান্য, নীল, পাট প্রভৃতির আবাদ কল্পে গভীর কর্ষণ করিয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, এই জন্য পাঠকগণকে সাবধান করিয়া দিতেছি যে, অবিমৃষ্যতাসহকারে কার্য্য না করিয়া, বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধিকরতঃ ধীরভাবে কার্য্য করাই সঙ্গত বরং প্রয়োজন বুঝিলে কোন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ লওয়ায় দোষ হয় না বরং ইহাতে কিছু ব্যয় হইলেও তাহা স্বীকার করা কর্ত্তব্য।

ভূমিকর্ষণ ও জলশোষণ।—ভূমি কর্ষণের ইতর-

বিশেষ অনুসারে মৃত্তিকার পরিশোষণ শক্তি পরিচালিত হইয়া থাকে। চুয়াইয়া যে জলশোষণ হয়, তাহাকে ইংরাজিতে (Percolation) কহে। ভূপৃষ্ঠের জল নিম্নদেশে কিরূপে যায় তাহা জানা একান্ত প্রয়োজন।

বৃষ্টি হইবার পর কিম্বা জলসেচন করিবার কিছুক্ষণ পরে মাটির উপরিভাগে একটী সর পড়ে, ক্রমে তাহা শুষ্ক হইয়া যায় ও কঠিন হইয়া পড়ে। এতদবস্থায় তাহাতে জলসেচন করিলে কিম্বা তাহার উপরে বারিপাত হইলে মাটিতে সহজে পরিশোষিত হয় না। যে গাছের গোড়ায় কয়েকদিন জল সেচন করা হয় নাই, তাহার গোড়ার মাটি কঠিন ও দৃঢ় হইয়া যায়, সে অবস্থায় তাহাতে জল পড়িলে তৎক্ষণাৎ পরিশোষিত হয় না, ইহা অনেকে দেখিয়া থাকিবেন এবং লক্ষ্য করিয়াও থাকিবেন। ক্ষণকালপরে ক্রমে সেই জল শোষিত হইতে থাকে এবং তখন দ্বিতীয়বার জল সেচন করিলে তন্মুহূর্ত্ত হইতেই জল শোষিত হইতে থাকে, এক্ষণে আর জলকে শোষিত হইবার জন্য অপেক্ষা বা উমেদারী করিতে হয় না। অতঃপর মাটির ভিতর যদি জলপূর্ণ থাকে, কিম্বা একবারে শুষ্ক থাকে, তাহা হইলে উপরের জল আর শোষিত হইবে না। ভূপৃষ্ঠের মাটি সরস না থাকিলে জল শোষিত হইতে পারে না। ভূপৃষ্ঠ কোমল থাকিলে তথাকার মাটি অল্লাধিক সরস থাকে, এই জন্য বারিপাত হইবার ক্ষণ হইতেই জল শোষিত হইতে থাকে। ইহা হইতে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, ভূগর্ভকে সরস রাখিতে হইলে ভূপৃষ্ঠকে সর্ব্বদা কোমল অবস্থায় রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। ক্রমে ক্রমে বৃষ্টি হইলে তাবৎ জলই মাটিতে শোষিত হয়। অল্পে অল্পে বারিপাত হইলে উপরি-

ভাগ হইতে ক্রমশঃ সেই জল নিম্নদেশে যাইতে থাকে, তাহার কারণ এই যে, উপরিভাগ হইতে নিম্নদেশের মাটি ক্রমশঃ ভিজিতে থাকে, পরমাণুগণের যাহা প্রেয়োজন বা রক্ষণ করিয়া রাখিবার শক্তি তাহাই তাহারা ধারণ করিয়া রাখে, অবশিষ্টাংশ নিম্নে নামিতে থাকে। নামিবার কালে যতক্ষণ না তাবৎ জল কণাসমুদায় ধারণ করিয়া লয় ততক্ষণ উহা নামিতে থাকে, অতঃপর জলের নিম্নগতি থামিয়া যায় কিম্বা তখন আর জলের উদ্বর্ত্ত থাকে না। পৃষ্ঠদেশ হইতে গর্ভদেশ পর্য্যন্ত মাটি বেস বহমান অবস্থায় না থাকিলে, যতই বৃষ্টি হউক, তাহা ভূগর্ভে শোষিত হইবার পরিবর্ত্তে অধিকাংশ বাষ্পাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ভূমি হইতে চলিয়া যায়। সেই সঙ্গে ভূমির সাবেক রসকেও লইয়া যায়।

উচ্চ ও টাঁর্ জমিকে বিশেষতঃ যে সকল জেলা বা প্রদেশের বারিপাত অপেক্ষাকৃত কম, অধিক কি, যথাকার চাষ আবাদের জন্য লোককে আকাশপানে তাকাইয়া থাকিতে হয়, তথাকার জমিকে সর্ব্বদা এরূপ অবস্থায় রাখিতে হয় যেন, বৃষ্টির তাবৎ জলই ভূমিতে শোষিত হয়। যে দেশে সামান্য বৃষ্টির অভাবে দেশ মধ্যে হাহাকার ধ্বনি উঠে তথায় একবিন্দু জল নষ্ট হইতে দেওয়া কোন মতে উচিত নহে। নাবাল প্রদেশস্থ জেলায় মাটি স্বভাবতঃই সিক্ত থাকে সুতরাং তথাকার জমিতে জল সঞ্চয় করিয়া রাখিবার তত প্রয়োজন হয় না, তথাপি জল অপচয় হইতে দেওয়া উচিত নহে। তথাকার জমিতে যে রস থাকে, তাহা যাহাতে সহজে উপরে উঠিতে পারে, সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিলেই চলে।

কোন্ নৈসর্গিক নিয়মে জল চুয়াইয়া থাকে তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে এক খণ্ড শোষক-কাগজ (Blotting paper)

অথবা একখণ্ড কাপড়কে জলে ঈষৎ সংলগ্ন করিয়া ধরিলে, উক্ত কাগজ বা কাপড়ের শোষকতানুসারে, শোষণ আরম্ভ হইতে দুই এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় কিন্তু যে মুহূর্ত্তে শোষণের সূত্রপাত হয় সেই মুহূর্ত্ত হইতে হু-হু করিয়া জল শোষিত হইতে থাকে এবং সেই অবস্থায় উক্ত খণ্ডকে জল হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে গেলে এতদুভয় এতই সম্বদ্ধ থাকে যে, পরস্পরে যেন স্বতন্ত্র হইতে চাহে না। একটী প্রবাদ আছে যে, 'পানি পানি খিঁচ্‌তা' অর্থাৎ 'জলে জল টানে।' বাঙ্গলায় ঐরূপ আর একটী প্রবাদ আছে 'জলে জল বাঁধে'। উল্লিখিত ঘটনার দ্বারা প্রবাদ কয়টীর সত্যতা প্রতিপন্ন হয়। শুষ্ক পদার্থ প্রথমাবস্থায় জলকে প্রত্যাখ্যান করে, পরে শুষ্ক পদার্থ ঈষৎ রসসিক্ত হইলে তবে শোষণ করিতে আরম্ভ করে। একথা লোকের ভাল লাগিতে না পারে কিন্তু ইহার মধ্যে একটী বিশেষ কথা আছে। 'যেন তেন প্রকারেণ' জীবিকানির্ব্বাহ করা এক কথা, আর পুত্র কলত্র লইয়া 'পাঁচজনের একজন' হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা আর এক কথা! এই কথাটী মনে রাখিলে এত কথাকে বাজে কথা মনে হইবে না, বরং কাজের কথা বোধে তদনুসারে কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি জন্মিবে, উৎসাহ বৃদ্ধি পাইবে। ভূকর্ষণের যুগান্তরকারী ক্যাম্বেল সাহেব এই প্রসঙ্গে একটী মহা মূল্যবান কথা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারা যায় না :—

"If we have a legal right to the crrop that grows on the land we till then why not raise a big crop instead of a small one." (H. W. Campbell. Nebraska, U. S. A.)

ক্যাম্বেল সাহেবের উক্ত উক্তিটী যে কত সারবান তাহা ব্যক্ত করিব কি? ভাষান্তরিত করিলে উহার মর্য্যাদা নষ্ট হয় বলিয়া ইচ্ছা হয় না যে উহার অনুবাদ লিখি, কিন্তু প্রয়োজন বোধে তাহা করিতে হইল। তিনি বলেন যে, ভূমির উপর যদি আমাদিগের পূর্ণসত্ত্ব থাকে তাহা হইলে উক্ত জমি হইতে পূর্ণমাত্রায় ফসল আদায় না করিয়া অল্পে সন্তুষ্ট হই কেন?

এঁটেল মাটির পরিশোষণ-শক্তি নিতান্ত ধীর ও মন্থর। একেই ইহার কণাসমূহ ক্ষুদ্র, তাহা ব্যতীত—আটাল। এতন্নিবন্ধন কণা ও ছিদ্রপথসমূহ পরস্পরে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন থাকে। ঈদৃশ মাটির জন্য শোষকতাকে সর্ব্বদা ক্রিয়াশীল অবস্থায় রাখিবার চেষ্টা করা উচিত এবং এতদর্থে গভীর কর্ষণ একান্ত স্পৃহনীয়।

প্রত্যেক বার বারিপাত হইলেই ভূপৃষ্ঠের ঝুরা মাটি দৃঢ় হইয়া বসিয়া যায় সুতরাং বারিপাতের পর যো পাইবামাত্রই পুনরায় ভূপৃষ্ঠকে ঝুরা করিতে দিতে হইবে, নতুবা পরবর্ত্তী বৃষ্টিতে তাদৃশ বা আদৌ জল শোষিত হইবে না। ভূপৃষ্ঠ হইতে তন্নিম্নস্তর (Sub-soil) সরস থাকিলে বৃষ্টির জল প্রায় নষ্ট হইতে পায় না, তাবৎ জলই ভূগর্ভে শোষিত হইতে পারে।

বাষ্পোদ্গীরণ।—ভূমি কর্ত্তৃক জল পরিগৃহিত হওয়া যেরূপ প্রয়োজন, ভূগর্ভ হইতে রস উদ্গীর্ণ হওয়াও তদনুরূপ প্রয়োজন, কারণ ক্ষেত্রের জল ভূপৃষ্ঠ বা ভূগর্ভ বহিয়া যত অধিক বহির্গত হইতে না পারে, ভূপৃষ্ঠ দিয়া তাহার বহুগুণ অধিক রস বাষ্পাকারে বহির্গত হইয়া থাকে। বাষ্পাকারে জল শুকাইয়া যাওয়াকে (Evaporation) কহে।

ক্ষেত্র মধ্যে যাহাতে বাষ্পোদ্গীরণ ক্রিয়ার পথ সরল থাকে

কৃষকের সে বিষয়ে দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। মাটি যতই রসাল হউক, ভূগর্ভে যতই রস ধৃত হইয়া থাকুক, সুচারুরূপে বাষ্পোদ্গীরণ কার্য্য সমাহিত হইতে না পারিলে সরস-নীরস মাটি মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে না। বৃষ্টির অভাব থাকিলেও মৃত্তিকায় যদির বাষ্পোদ্গীরণশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা হইলে উদ্ভিদে রসাভাব হয় না। কর্ষণাদির পর ভূমিকে অনর্থক পতিত থাকিতে দিলে ক্ষেত্রস্থ সমূহ রস বাষ্পাকারে বহির্গত হইয়া যায়। কর্ষিত ও অকর্ষিত ক্ষেত্রের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে এক একটী ধাতু বা কাচ পাত্রকে ক্ষণকাল উল্টাইয়া রাখিয়া দিলে পাত্রের গাত্রে শিশির-বিন্দুসদৃশ জল সঞ্চিত হইয়াছে—দেখা যাইবে। আরও দেখা যাইবে যে, অকর্ষিত ক্ষেত্রস্থ পাত্রাপেক্ষা কর্ষিত ক্ষেত্রস্থ পাত্রে অধিক জলবিন্দু সঞ্চিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, কর্ষিত ক্ষেত্রে সমধিক বাষ্পোদ্গীরণ হয়। অতঃপর পরীক্ষা দ্বারা ইহাও নির্ণীত হইয়াছে যে, অর্দ্ধশুষ্ক বা অনতিসিক্ত প্রদেশ অপেক্ষা রসা বা সিক্ত প্রদেশে অধিক বাষ্পোদ্গীরণ হয়। শেষোক্ত স্থানে যত বারিপাত হয় তাহার অর্দ্ধাংশ বা ততোধিক বাষ্পাকার ধারণ করতঃ ভূমি হইতে বহির্গত হইয়া যায়, তাহার কারণ এই যে, রসা ভূমির রসালতা নিবন্ধন বহু রস অল্প সময় মধ্যে বহির্গত হয় কিন্তু তদপেক্ষা শুষ্ক ভূমি তাদৃশ সরস না থাকায় তাহা হইতে অতি মৃদু গতিতে বাষ্প উৎপন্ন ও বহির্গত হয়। তথাপি যে অনতিসিক্ত জমির মাটি এত নিরস হইয়া যায় তাহার কারণ অনেকে নির্দ্দেশ করেন যে সমধিক বারিপাতের অভাব। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাহা নহে। কর্ষণাদির পারিপাট্যাভাব হেতু যাহাতে অযথাপরিমাণে বাষ্পোদ্গীরণ হইতে না পারে,

তাহারই প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা কৃষকের একান্ত কর্ত্তব্য। আমেরিকা যুক্তরাজ্যের কৃষি আচার্য্যগণ, বিশেষতঃ প্রোফেসর হুইট্‌নী, কিং, ও হিল্‌গার্ড বহু পরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বৃষ্টির তাবৎ জলকে আদৌ নষ্ট হইতে না দিয়া বিবেচনা সহকারে খরচ করিতে পারিলে ৭-ইঞ্চ বারিপাতে যে কোন ফসলেরই সুশৃঙ্খলে আবাদ হইতে পারে। এতদ্দর্শনে আমরা কেবল যে বিস্মিত হই, তাহা নহে, পরিতাপে মুহ্যমান হইয়া পড়ি। বিশাল বাঙ্গলা দেশ মধ্যে এমন কোন জেলা দেখা যায় না যথাকার বার্ষিক বরিপাত ৪০ ইঞ্চ হইতে কম, তথাপি এ দেশের লোকে বৃষ্টির জন্য লালায়িত। ষোড়শ বৎসর কালের অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও পরীক্ষা ফলে ক্যাম্বেল সাহেব যে সিদ্ধান্তে পরিণত হইয়াছেন তাহা উদ্ধৃত হইল,—

"Our experience in these sixteen years has been quite varied, but each and every year some new and important has been brought out, all leading to the one conclusion, that the rainfall can be stored in the ground, and its evaporation prevented by a proper manipulation of the soil, thus enabling us to secure, not only fair, remarkably good crops any and every year."

অধিকাংশ স্থলেই আমরা ইচ্ছা, অবহেলা বা আলস্য করিয়া বৃষ্টির জলকে নষ্ট হইতে দিই। এক বিন্দু বৃষ্টির জন্য কত কত সময়ে কৃষককে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয়, কিন্তু রাশি রাশি জল নষ্ট হইতেছে বা ব্যবহার হইতেছে না, তাহা আমরা

দেখিয়াও দেখি না। পৃথিবীতে যত বারিপাত হইতেছে তাহা অনর্থক নষ্ট হইবার জন্য নহে, কিম্বা যখনই বৃষ্টি হয় তখনকারই ব্যবহারের জন্য নহে। একদিকে যেরূপ বৃষ্টির বা সেচিত জলকে সাধ্যমত ভূগর্ভ মধ্যে শোষিত হইতে দিতে হয়, অন্যদিকে সেইরূপ উক্ত রস যাহাতে ক্ষেত্রস্থ ফসলের প্রয়োজনে আসিতে পারে এবং অপর সময়ে বাষ্পাকারে বহির্গত হইয়া যাইতে না পারিয়া ভূগর্ভদেশে আবদ্ধ থাকে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। ইংরাজিতে একটী কথা আছে যে, "Waste not Want not" অর্থাৎ অপচয় করিও না অভাব হইবে না। ফসলের সময় বৃষ্টি হইলে সে জল উদ্ভিদের কাজে আইসে, কিন্তু অসময়ে হইলে আপাততঃ তাহা কাজে আসে না বলিয়া উক্ত জলকে আমরা ধরিয়া রাখিবার জন্য কোন উপায় অবলম্বন করি না। কিম্বা ধরিয়া রাখা হইলেও যাহাতে সেই সেই জল অপ্রয়োজনে বা অযথা উদ্গীর্ণ না হয়, তাহার কোন উপায় করি না। যথা সময়ে ক্ষেত্রকে কর্ষণাদি দ্বারা বাষ্পো-দ্গীরণের পথ রুদ্ধ করা উচিত। উচ্চ ও শুষ্ক দেশের আবাদের জন্য জলের বড়ই প্রয়োজন এবং এই সকল দেশেই প্রায় জলাভাবে ফসলের অনিষ্ট হয়।

ধান-জমিতে অধিক জল সঞ্চিত না হইলে ফসল ভাল হয় না, এই জন্য সামান্য বারিপাতকে কিম্বা অসময়ের বারিপাতকে কৃষকগণ বড় বা আদৌ গ্রাহ্য করে না, কিন্তু কৃষকদিগকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, প্রত্যেক বারিবিন্দুই সংরক্ষণীয়, কারণ তাহাই ভবিষ্যতে ফসলকে রস সরবরাহ করে

ভূমিকর্ষণের যে কয়টী উদ্দেশ্য তাহাদিগের মধ্যে প্রধান

তিনটীর উল্লেখ করিয়াছি, এক্ষণে চতুর্থের আলোচনা করিব। উক্ত বিষয়—

আগাছা নিবারণ।—ভূমিকে কর্ষণ করিলেই, তজ্জাত তৃণজঙ্গলাদি উৎপাটিত হইয়া পড়ে, গাছের মূল ছিঁড়িয়া যায়। এইরূপে ক্ষেত্র পরিষ্কৃত হয় এবং সেইজন্য ক্ষেত্র তৃণজঙ্গলময় হইয়া পড়িলে মধ্যে মধ্যে হলচালনা করিতে হয়। উক্ত আগছাদিগকে দীর্ঘকাল ভূমি দখল করিয়া থাকিতে দিলে উহারা ক্ষেত্রস্থ উদ্ভিদখাদ্য অপহরণ করিয়া জীবিত থাকে ও বৰ্দ্ধিত হয়, এবং কৃষক অর্ব্বাচীন হইলে উক্ত আগাছাদিগকে হয় ক্ষেত্র হইতে বহির্গত করিয়া দেয়, না হয় ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে জ্বালাইয়া দেয়। ক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইতে দিলে উহারা মৃত্তিকার জৈব অজৈব—অনেক পদার্থ লইয়া যায়, ক্ষেত্রের পক্ষে ইহা অকল্যাণকর। তবে উহাদিগকে জ্বালাইয়া দিলে অধিকাংশস্থলে প্রায়ই ভস্মই অবশিষ্ট থাকে। উক্ত ভস্ম ক্ষেত্রান্তর্গত পূর্ব্ব অজৈব (inorganic) পদার্থ মাত্র। যাহাহউক, ভস্মের দ্বারাও ক্ষেত্রের প্রভূত উপকার হয়। উক্ত ভস্মাবশেষ সম্পূর্ণরূপে ভস্মে পরিণত হইয়া না থাকিলে অঙ্গারাদি কোন কোন বাষ্পীয় পদার্থ অসম্পূর্ণ-দগ্ধ পদার্থ মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তন্নিবন্ধন উক্ত পদার্থ দ্বারা বায়ুমাণ্ডলিক নাইট্রোজেন আহরিত হইয়া ক্ষেত্রের বিনষ্ট সারের অনেক সহায়তা করে। অঙ্গারিক পদার্থ (charcoal) স্বভাবতঃ স্বকীয় পরিমাণ অপেক্ষা নব্বুই গুণ আমোনিয়া নামক যবক্ষার-জান-প্রধান বিমুক্ত বাষ্প ধারণ করিয়া রাখিতে সমর্থ কিন্তু উক্ত ভস্ম মাত্র অজৈব পদার্থ হইলে সে কার্য্য সংসাধিত হয় না। এরূপ স্থলে ক্ষেত্রে যবক্ষারজানজাত সার বা জৈব পদার্থ সংযোজিত

করিতে হয়। যাহা হউক, আগাছা নিবারিত হইলে, তাহাদিগের মূলও পত্রশাখাপ্রশাখাদি ক্ষেত্রে স্থান পায় তন্নিবন্ধন মৃত্তিকা পূর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা হয়। কেবল তাহাই নহে, এতদ্দ্বারা ভাবী ফসলের উদ্ভিদগণ সদ্য আহরণোপযোগী খাদ্য সামগ্রী স্ব স্ব আয়ত্ত মধ্যে প্রাপ্ত হয়। উদ্ভিদ শরীর, ভূমিও বায়ুমণ্ডলস্থ পদার্থ সমূহের সমাবিষ্ট ফল তাহা সকলেই বিদিত আছেন। এই জন্য এক উদ্ভিদ অপর উদ্ভিদের এত শীঘ্র কাজে আছে। এতদ্দ্বারা ক্ষেত্রে হরিৎসার প্রদানের কার্য্য সিদ্ধ হয়।

ভূমি মধ্যে সদ্য আহরণোপযোগী পদার্থই উদ্ভিদগণ গ্রহণ করিয়া থাকে। আগাছা, অগাছা হইলেও উদ্ভিদ ত বটে, সুতরাং উহারাও ভূমি হইতে সদ্য আহরণোপযোগী প্রস্তুত খাদ্য আহরণ করে, ইহা বলাই বাহুল্যমাত্র। যাহাহউক, উদ্ভিদ শরীরে যে কিছু পদার্থ বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়, তাহা উল্লিখিত কারণে অতিশয় সূক্ষ্ম এবং ভূম্যান্তর্গত আহারীয় অপেক্ষা লঘু ও শীঘ্র আহরণীয়। বারম্বার আগছা নির্ম্মূলিত হইয়া সেই স্থানেই মাটি হইলে কাজেই জমি আরও সারাল হয়। এতদ্ব্যতীত, গাছ জন্মিলেই তাহাদিগের মূলগণ ভূগর্ভমধ্যে বিচরণ করে, তন্নিবন্ধন মাটি বেশ আল্‌গা হইয়া থাকে, উপরন্তু সেই মূলসমূহের শেষাগ্রভাগের দ্রাবক সংযোগে মৃত্তিকার উপাদান-জৈব অজৈব নির্ব্বিশেষে-অল্পাধিক গলিত হইয়া থাকে। পুনঃ পুনঃ আগাছার বিনাশ হইলে, ক্ষেত্র পরিষ্কৃত হইয়া উল্লিখিত নানাবিধ উপকার প্রাপ্ত হয়।

অনাবাদী অবস্থায় ভূমি পতিত থাকিলে তাহাতে স্বতঃই নানাবিধ দুর্দ্দমনীয় তৃণ, উলু, ঝাড়ি, ডাভি, কণ্টকাকীর্ণ শিয়াল-কাঁটা, শিয়ালল্যাজা প্রভৃতি জন্মে। ইহারা একবার স্থান পাইলে,

বিশেষতঃ একবার বীজধারণ করিতে পারিলে আর রক্ষা নাই, কারণ সেই সকল বীজ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত মাটির মধ্যে লুকায়িত থাকিয়া অবসর ও সুযোগমত অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। উহাদিগকে একবারে নির্ম্মূল করিয়া বিনাশ করা তখন একটী বিষম কার্য্য হইয়া পড়ে। এতদর্থে একটী ইংরাজি প্রবাদ মনে পড়িয়া গেল "one year's seeding is nine year's weeding." এই সকল বন্ত অমরপ্রায় উদ্ভিদে একবার বীজ জন্মিলে বহুকাল ধরিয়া তাহাদিগকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়। ক্ষেত্রকর্ষণ দ্বারা অপরিপুষ্ট অবস্থায় জঙ্গলদিগকে বিনাশ করিলে হরিৎসার প্রদানের কার্য্য হয়, অপিচ দুর্দ্দান্ত আগাছাগণ ও বিলুপ্ত হয়।

আর্দ্রভূমিকে শুষ্ককরণ।—কর্ষণগুণে ভূমির সরসতা উৎপন্ন করা যায়, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে দেখিব, কর্ষণফলে মাটি শুষ্ক হয় কিরূপে? জলসঞ্চিত ক্ষেত্র শুষ্ক হইয়া আবাদোপযোগী হইতে বহু কালক্ষয় হয়, তন্নিবন্ধন অনেক স্থলে ভাবী ফসলের পত্তন করিতে অনর্থক অনেক সময় নষ্ট হয়। ইহা অবশ্য লাভের কথা নহে। জলসঞ্চিতাবস্থায় তলাচির ছিদ্রপথের মুখ সকল রুদ্ধ হইয়া যায়, তাহার দুইটী কারণ আছে, ১ম,—মাটির সরে যে পলি থাকে তদ্দ্বারা তলাচি আবরিত হইয়া যায়; ২য়,—রসাধিক্য হেতু মৃত্তিকান্তর্গত ধাতবীয় পদার্থের ধোয়াট ভূমির পৃষ্ঠদেশের ছিদ্রপথসমূহের মুখে সঞ্চিত হয়। ছিদ্র-পথের মুখ রুদ্ধ হইবার ইহা অন্যতম কারণ। ছিদ্রপথের মুখসমূহ রুদ্ধ হইয়া গেলে বাহ্য প্রকৃতির সহিত ভূগর্ভের কোন সংস্রব থাকে না। ঈদৃশ অবস্থায় জলসঞ্চিত ক্ষেত্রকে অনর্থক পতিত থাকিতে না দিয়া কর্ষণ করিলে ক্ষেত্রস্থ সমুদায় জল ভূগর্ভ মধ্যে নামিয়া যায়,—

ভূগর্ভে জল সঞ্চিত থাকে। ইহা মনে রাখা উচিত যে, ক্ষেত্রের এবম্বিধ অবস্থায় কর্ষণ করিলে মাটি আপাততঃ কাদাটে হইয়া যায়, কিন্তু তাহা হইলেও কর্ষণগুণে মৃত্তিকা বিচলিত হয়, সুতরাং উপরের জল নিম্নস্তরে নামিয়া যাইতে থাকে। অতঃপর উক্ত কাদাটে জলাচিতে ২।১ দিবস রৌদ্র ও বাতাস লাগিলে সেই কর্দ্দমসদৃশ মাটি পরবর্ত্তী কর্ষণে চূর্ণ হইয়া যায়। অনেক নাবাল জমিতে সমূহ জল সঞ্চিত না হইলেও সন্নিহিত ভূমি সকলের নিম্নতলতাহেতু উক্ত জমির অবস্থা নিতান্ত জলপূর্ণ হয় ও তল্ তল্ করিতে থাকে। নিকটস্থ সরোবর বা ডোবাসমূহ বর্ষায় জলপূর্ণ হইয়া গেলেও স্থানীয় জমির জল মাটি চুয়াইয়া নামিতে পারে না এবং যতদিন না সেই সকল জলাশয়ের পৃষ্ঠ নিচু হয়, ততদিন ক্ষেত্রে হলচালনাদি অসম্ভব হইয়া পড়ে, অন্যদিকে ক্ষেত্রের রস ও জল রৌদ্রে শুকাইয়া যায় ফলতঃ ক্ষেত্রের রস নষ্ট হয়। ঈদৃশ ভূমির নিম্নতাবশতঃ কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত জলপূর্ণ থাকে কিন্তু ঈদৃশ অবস্থায় কর্ষণ করিয়া ভূগর্ভমধ্যে সঞ্চিত জলকে নামাইয়া দিলে অনেক পূর্ব্বে আবাদের সূত্রপাত করিতে পারা যায়। অনেকের আশঙ্কা হইতে পারে যে, জলমগ্ন বা রসাবস্থায় কর্ষণ করিলে ভূমির সমূহ ক্ষতি হইতে পারে। এ কথা সত্য কিন্তু যাহাতে না ক্ষতি হইতে পারে, এজন্য তাদৃশ জমিকে এক-আধবার কর্ষণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। প্রথমবার কর্ষণ করিবার পর, মাটির জল টানিয়া গেলেই অবিলম্বে পুনঃ পুনঃ কর্ষণাদি দ্বারা যথানিয়মে কার্য্য সমাধা করিতে হইবে কিন্তু দেখিতে হইবে যেন ক্ষেত্রে ঢেলা বাঁধিয়া না যায়।

—০—

নির্জ্জলা আবাদ।

—:০:—

নির্জ্জলা আবাদ।—Dry culture কথাটী পাশ্চাত্য-দেশ হইতে সম্প্রতি এ দেশে আমদানী হইয়াছে সুতরাং ইহাকে অনেকেই অভিনব ব্যাপার বলিয়া মনে করিতেছেন, কিন্তু আসল কথা তাহা নহে। কেবল ভারতবর্ষে কেন, বহু দেশেই, বিশেষতঃ লঘুবারিপাত-প্রদেশে বা জেলায় নির্জ্জলা আবাদ চিরকালই প্রচলিত আছে, তবে আমাদিগের ন্যায় যে সকল দেশে কৃষির প্রতি লোকের তাদৃশ যত্ন বা আগ্রহ নাই, সেই সেই স্থানেই এতদ্বিষয়ে কোন আলোচনা নাই। বহু বারিপাত, নির্জ্জলা আবাদের অনুকূল নহে। স্বল্পবারিপাত-প্রদেশের চাষ-আবাদকে সুশৃঙ্খলে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্যই নির্জ্জলা আবাদের প্রয়োজন ও প্রবর্ত্তন।

জলজ বা অর্দ্ধ জলজ ভিন্ন সকল ফসলই অল্পাধিক পরিমাণে নির্জ্জলা আবাদের অন্তর্ভুক্ত। ভারতের যাবতীয় রবি ফসল—গোধূম, রাই, সর্ষপ, তিসি, বুট, মটর, কড়াই, বহুবিধ দ্বিদল, ধনে, মৌরী—নির্জ্জলা আবাদের অন্তর্গত, কারণ এতৎ ফসল সমূহ বৎসরের যে সময়ে আবাদিত হয়, তখন বর্ষাকাল নহে, সে সময় বর্ষা বা বারিপাতের তত আশা বা আশঙ্কা থাকে না।

জল বিনা কোন উদ্ভিদ বাঁচিতে পারে না, ইহা আমরা সকলেই অবগত আছি, তথাপি গোধূমাদি রবি ফসল কিরূপে সম্ভব হয়? অগ্রহায়ণ বা পৌষ বা মাঘ মাসে বিস্তীর্ণ প্রান্তর ভেদ করিয়া চলিয়া গেলে কত শত ক্ষেত্রে নানাবিধ ফসল

লাবণ্য বিকাশ করতঃ দর্শকের নয়ন-মন হরণ করে? কিন্তু সেই ফসল সমূহ জীবিত থাকিবার ও শস্য প্রদান করিবার উপযোগী রসখাদ্যাদি কোথায় পায়? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, ভূগর্ভ মধ্যে ইতঃপূর্ব্ব হইতে যে বারি সঞ্চিত হইয়া আছে তাহাই যৌগিকাকর্ষণে ভূপৃষ্ঠাভিমুখে আসিতে থাকে। তৎকালে মূলগণ সেই রস সাধ্যমত আহরণ করিতে থাকে এবং তাহাতেই উদ্ভিদগণ জীবিত থাকে। ভূগর্ভমধ্যে রস সঞ্চিত থাকিবার ব্যবস্থা না থাকিলে মানুষকে কেবল আকাশের জলের উপর নির্ভর করিতে হইত, ফলতঃ কেবল বর্ষাজীবী ফসলের আবাদ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। কেবল তাহাই নহে। মাত্র বর্ষাজীবি ফসলের উপর নির্ভর করিতে হইলে ভারতের ন্যূনাধিক বারো আনা লোককে ইহলোক হইতে বিদায় লইতে হয়। বর্ষাজীবী ফসলের মধ্যে ধান্য, মাড়ুয়া, মকাই (ভুট্টা), চীনে, কাঙনী প্রভৃতি কয়টী মাত্র প্রধান ফসল। তাহা হইলেও, উল্লিখিত ফসলগণের মধ্যে মাত্র ধান্য ব্যতীত অপর ফসল কেবল গরীব দুঃখী শ্রমজীবীগণই খাইয়া থাকে। ভূমির প্রাকৃতিক অবস্থান উচ্চতা বা নিম্নতা ভেদে বর্ষার ফসলেও বারিপাতের অভাব হয় লোকে পাহাড়ীয়া ও অসমতল দেশের নাবাল ও জোল সদৃশ স্থানে ধান্যের এবং অপরাপর স্থানে ভুট্টা মাড়ুয়া প্রভৃতির আবাদ করে। নির্জ্জলা আবাদের প্রধান কয়টী নিয়ম নিম্নে লিখিত হইল :—

১ম।—বর্ষার তাবৎ জলকেই ক্ষেত্রমধ্যে অবরুদ্ধ করা; ২য়,—সেই সংগৃহিত জলকে ভাবী ফসলের আহরণ করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা; ৩য়,—উক্ত সঞ্চিত জল যাহাতে না অপচয়

হইতে পারে তাহার সুবন্দোবস্ত করা। ইহাই হইল নির্জ্জলা আবাদের প্রধান অঙ্গ।

ভূমির পৃষ্ঠদেশ যতই শুষ্ক, যতই নির্জ্জলা বলিয়া মনে হউক, উহার গর্ভদেশে জল আছেই সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ক্ষেত্র আবাদিত না হইলে উপরিভাগের মাটি শুষ্ক হইয়া যায়, ফলতঃ ভূগর্ভদেশের সহিত পৃষ্ঠদেশের রসের সংযোগ ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়; নিম্নভাগে যে রস থাকে তাহা যৌগিক আকর্ষণের অভাবে এবং মাধ্যাকর্ষণবশে ক্রমশঃ গভীরতম দেশে নামিয়া যায়। ঈদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ক্ষেত্রকে যতই কর্ষণ করা যাউক, যতই 'চাদরিত' করা যাউক,যতই তাহার অঙ্গ পরিচর্য্যা করা যাউক কিছুতেই আর নিম্নদেশের রসের সহিত উপরিভাগের সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইতে পারে না। এক্ষণে উত্তম বারিপাত না হইলে কিম্বা ক্ষেত্রে উত্তমরূপে জল সেচিত না হইলে কোন কাজই হয় না। বৃষ্টির জলে হউক বা কৃত্রিম উপায়ে হউক, ভূপৃষ্ঠ সিক্ত হইয়া উক্ত জল ক্রমশঃ নামিয়া গিয়া নিম্নস্তরের রসাল ভূমির সহিত মিলিত হইলে তবে পুনরায় নিম্নভাগের রস উপরিভাগে উঠিতে থাকে।

শুষ্ক আবাদ ও সার।—তরি-তরকারি, ফল ফুল প্রভৃতি বহুবিধ ফসল উদ্যান মধ্যে অথবা ঔদ্যানিক ফসলরূপে আবাদিত হইয়া থাকে। ঔদ্যানিক কৃষির বিশেষত্ব এই যে, কোন সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ স্থান মধ্যে অবিচ্ছিন্নভাবে বিবিধ ফসলের আবাদ হইয়া থাকে। মেঠো কৃষির ব্যবস্থা অন্যরূপ, কারণ মাঠ মধ্যে কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট ফসলের আবাদ হয় মাত্র এবং তাহাতেও পর্য্যায়ের নিয়ম অনুসৃত হয়। ঔদ্যানিক ফসলের আবাদে প্রায়

সার ব্যবহৃত হয় এবং অতিশয় ঘন ঘন ক্ষেত্রকে কর্ষণ করা হয়, এই জন্য ঔদ্যানিক ফসলের জন্য ক্ষেত্রে যখন-তখন সার দেওয়া চলে। ঔদ্যানিক আবাদে যথেষ্ট সার ব্যবহৃত হয় বলিয়া উদ্যান ভূমি সচরাচর সারাল হয়, এজন্য কোন ফসল রোপণের অব্যবহিত পূর্ব্বে ক্ষেত্রে সার না দিলে কোন ক্ষতি হয় না। কৃষিক্ষেত্রে তাহা হয় না। কৃষিক্ষেত্রে সার প্রদান করিতে হইলে কিছুদিন পূর্ব্বে সার দিতে হয়। এরূপ করিলে মাটির সংস্পর্শে থাকিয়া ফসল রোপণের পূর্ব্বে উক্ত সার বহু পরিমাণে বিগলিত হইয়া উহাদিগের আহরণোপযোগী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভূমি গভীররূপে কর্ষিত হইলে প্রদত্ত সার সমধিক পরিমাণ মাটির সহিত সূক্ষ্মভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, ফলতঃ অপেক্ষাকৃত শীঘ্র বিগলিত হয়। এতদ্ব্যতীত, সূক্ষ্মবিস্তার হেতু সারের কার্য্যতৎপরতা অধিক হয়। লঘুকর্ষণে প্রদত্ত সার উপরিভাগের ক্ষীণস্তরে আবদ্ধ থাকে, তন্নিবন্ধন একদিকে রৌদ্রে ও বাতাসে উহার অনেক বাষ্পীয় পদার্থ বায়ুমণ্ডলে চলিয়া যায়, অন্যদিকে বর্ষার জলে কতক সারাংশ ধোয়াটরূপে ক্ষেত্রের উপরিভাগ দিয়া বাহির হইয়া যায়, আবার কতক অংশ ভূগর্ভমধ্যে চুয়াইয়া নামিয়া যায় কিন্তু কর্ষণের লঘুতা হেতু উদ্ভিদের মূলগণ তদ্দূরে নামিতে পারে না। এই সকল কথা ভাবিয়া দেখিলে গভীর কর্ষণের সহিত সার প্রদানের সম্বন্ধনৈকট্য বেশ উপলব্ধি হয়। মেঠো ফসলগণ সার প্রদানের সদ্য বা আশু উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারে না এজন্য ফসলপত্তনের পূর্ব্বে ক্ষেত্রে সার সংযোজিত করিয়া গভীর কর্ষণ দ্বারা সারকে সমধিক মাটির সহিত মিশাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। এতদ্দ্বারা আরও বিশেষ লাভ এই যে, সার ভূগর্ভের সমধিক

রসের সংস্পর্শে আসে, তন্নিবন্ধন অপেক্ষাকৃত শীঘ্র ও সুক্ষ্মভাবে বিগলিত হইয়া মাটির মধ্যে আবদ্ধ থাকে।

শুষ্ক আবাদের অন্তর্গত যাবতীয় ফসল, তৎসমুদায়ের আবাদ সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহিত করিতে হইলে ভূপৃষ্ঠের মাটি চূর্ণীতাবস্থায় রাখা নিতান্ত প্রয়োজন কিন্তু তাহা না হইলে ইতঃপূর্ব্বে যতই বারিপাত হইয়া থাকুক তদ্দ্বারা কোন উপকার দর্শিতে পারে না। প্রতিনিয়ত আমরা দেখিতেছি যে, ফসলসমূহ নিস্তৃণাবস্থা অতিক্রম করিলে আর কেহ তাহাদিগের কোন পরিচর্য্যা করে না, এবম্বিধায়, বৃষ্টি না হইলেও মাটি আপন ভারে ও তাহার সহিত বায়ুভার সংযোজিত হইয়া ক্রমশঃ দৃঢ় হইয়া যায়, তন্নিবন্ধন মৃত্তিকার ক্রিয়াশীলতা শিথিল হইয়া পড়ে। ভূপৃষ্ঠ হালকা ও লঘূ থাকিলে ফসলের যে রসাভাব হয় না, ইহা যখন কৃষক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, তখন হইতে সে আর ফসলের প্রতি ঔদাস্য প্রকাশ করিবে না। আজকাল নগদ পয়সা পাওয়া যায় বলিয়া কৃষিজীবী জন-মজুরী চাষ-আবাদের সময় সহরের কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া স্ব স্ব গ্রামে চলিয়া গিয়া, হয় নিজ নিজ চাষ আবাদে কয়েকদিনের জন্য মনোযোগ দেয় এবং কোন সময়ে বীজাদি বপন বা রোপণ করে, কিম্বা কোন সময় ফসল সংগ্রহ করিয়া থাকে, না হয় গ্রামস্থ অপর সঙ্গতি সম্পন্ন-কৃষকের ক্ষেত্রে কাজ করিয়া থাকে। যে কোন কার্য্যেই নিযুক্ত থাকুক, কার্য্য শেষ হইলে পুনরায় তাহারা জন-মজুরীর কাজে চলিয়া যায়। এতদ্দ্বারা বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায় যে, কৃষিজীবীগণের ইহাই দৃঢ়বিশ্বাস যে, চাষ-আবাদের আরম্ভকাল ও শেষাবস্থাতেই তথায় উপস্থিত থাকা তাহাদিগের প্রয়োজন কিন্তু এতদুভয়কালের মধ্যবর্ত্তী

দীর্ঘকাল মধ্যে ক্ষেত্রের যে অনেক পরিচর্য্যার প্রয়োজন ইহা তাহারা শিখে নাই এবং তাহাদিগকে শিখাইবার কেহ কোন চেষ্টা করে নাই। কৃষিজীবীগণ নিকটবর্ত্তী বিশিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে নিয়মে ও যে প্রণালীতে কাজ করে, তাহার পরক্ষণেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে গিয়া সে সকল উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রাচীন পদ্ধতির অনুসরণ করে—ইহা লেখকের বিশেষ বিদিত। লেখকের অধীনে নানা স্থানে—বিশেষতঃ মুরশিদাবাদ ও দ্বারভাঙ্গায়—শতাধিক জন নিয়মিতভাবে প্রতিদিন কাজ করিত এবং ইহাদিগের মধ্যে প্রায় বারো-চৌদ্দ আনা জন নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে প্রতিদিন দুই বেলা কাজ করিতে আসিত। ইহাদিগের অনেকের নিজ নিজ ক্ষেত ছিল এবং অনেকের ক্ষেত লেখকের ক্ষেত্রের সংলগ্ন। সরকারী কাজ করিয়া সকালে বেলা এগারটার সময় ছুটী পাইলে তাহারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে গিয়া কাজ করিত, কেহ বা প্রতিবেশীর কাজ করিয়া দিত। তাহাদিগের কার্য্য প্রণালী দেখিবার জন্য লেখক তাহাদিগের কার্য্যকালে কোন কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইতেন ও তাহাদিগের কার্য্য প্রণালী বিচক্ষণতা সহকারে দেখিতেন। আশ্চর্য্য এই যে, লেখকের নিকট তাহারা বহুদিন কার্য্য করিয়া কার্য্যদক্ষ হইয়াও নিজ নিজ ক্ষেত্রে গিয়া সে সকল প্রণালীপদ্ধতি ত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ী হুড়াহুড়ী করিয়া সেই প্রাচীন প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিত! পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তাহাদিগের মধ্যে অনেকের জমি লেখকের অধীনস্থ চৌহদ্দির সংলগ্ন। এতন্নিবন্ধন তাহাদিগের চাষ-আবাদ দেখিবার বড় সুবিধা হইত। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া একদিন তদীয় মেটের (সর্দ্দার) সহিত লেখকের যে, কথোপকথন হইয়াছিল

তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন ভাবিয়া নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

প্রশ্ন। আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে সরকারী বাগানে আমারই নির্দ্দিষ্ট প্রণালীমতে কাজ করিয়া আসিলে, আর সেই ভাবে বহুদিন তথায় কাজ করিয়া আসিতেছ, কিন্তু নিজ ক্ষেত্রে আসিয়া সে প্রণালীতে কাজ কর না কেন ?

মেট।—হুজুর! আপনার অধীনে বহুলোক কাজ করে সুতরাং যত ইচ্ছা লোকদ্বারা আপনি ক্ষেত্রের যথেষ্ট পাট-পরিচর্য্যা করিতে পারেন। আমাদিগের লোকবল নাই, অর্থবল নাই, তত সময়ও নাই, সুতরাং আমরা কিরূপে ক্ষেত্রের বা ফসলের অত পাট-তদ্বির করিতে পারি।

প্রশ্ন।—সরকারী ক্ষেতে যেমন অধিক পাট-তদ্বির হয়, তেমন ফলন বেশী হয়। তোমরা অধিক জমিতে আবাদ না করিয়া অল্প জমিতে ভাল করিয়া আবাদ করিলে পার ত ?

উঃ।—বাবু! আমরা অত পাট করিতে পারি না বলিয়াই বেশী জমীর আবাদ করি।

প্রশ্ন।—যদি পাঁচ বিঘার ফসল দুই বিঘা হইতে পাও, তবে তাহা না করিয়া অনর্থক এত খাজনা দাও, এত মজুরী খরচা কর কেন ?

উঃ।—আমাদিগের জমির পরিমাণ কমাইতে ভরসা হয় না। আর জমি যদি ছাড়িয়া দিই, আর অল্প জমিতে অধিক ফসল জন্মাই তাহা হইলে অর্থাৎ ফসল বেশী দেখিলেই জমীদার হার বৃদ্ধি করিবেন।

প্রশ্ন। হার বৃদ্ধি হইলেও অন্য অনেক অনেক খরচ ত বাঁচিয়া যায়।

উঃ।—কিন্তু সরকারী লাঙ্গলের ন্যায় বিলাতি লাঙ্গল, বড় বড় বলদ, অত গোয়া (সার) আমরা কোথায় পাইব? আর আমাদের সময়ই বা কই। কাজে যাইতে একটু বিলম্ব হইলে গর-হাজির হইতে হইবে, একদিন গর-হাজির হইলে দুই দিনের তঙ্কা (বেতন) কাটা যাইবে............।

মেটের কথাগুলি সারগর্ভ হইলেও সে কিছুতেই বুঝিবে না যে, অল্প জমিতে উৎকৃষ্ট আবাদ করিলে অল্প খরচ পড়ে অথচ ফলন বেশী হয়। অবশ্য হাল-বলদের কথা স্বতন্ত্র, কারণ গরীব কৃষক আধুনিক উন্নত লাঙ্গল টানিবার জন্য বড় জাতীয় বলদ খরিদ করিবার সঙ্গতি কোথা? এস্থলে আমার চিরসঙ্কল্পিত "পল্লী-ভাণ্ডারের" কথা মনে পড়িল। প্রস্তাবান্তরে তাহা বলিব।

ইদানিং বঙ্গের কৃষি ক্রমশঃ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে। এক শ্রেণীর কৃষি কৃষিজীবীগণ মামুলি হিসাবে অর্থাৎ (চির পদ্ধতি অনুসারে) করিতেছে এবং অন্য শ্রেণী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণ দ্বারা নির্ব্বাহিত হইতেছে। এতদুভয়েই বিস্তৃত কৃষির অনুগামী। চির প্রচলিত নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কৃষকগণ ক্ষেত্রের আয়তন হ্রাস করিতে রাজি নহে কারণ অনেকের ভয় যে, তন্নিবন্ধন ফলন বা আয় হ্রাস পাইবে, আবার অনেকের ইজ্জতের ভয়, আবাদের আয়তন হ্রাস করিলে গ্রামস্থ সকলের নিকট সম্ভ্রম হ্রাস হইতে পারে, ইহাও বিশেষ বিবেচনার বিষয়। কৃষকদিগকে আমরা কিছুতেই বুঝাইতে পারিব না অধিকন্তু তাহারা বুঝিলেও তদনুসারে কার্য্য করিতে

যে সহজে সম্মত হইবে, তাহাও বিশ্বাস হয় না. সুতরাং আধুনিক কৃষিকল্পে আপাততঃ কৃষকদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইবে।

শিক্ষিত ভদ্রলোকগণ আজকাল কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিতেছেন, ইহা একদিকে মঙ্গলের, অন্যদিকে আশঙ্কার কথা। মঙ্গলের কথা এই জন্য যে, তাঁহাদিগের বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, অধিকন্তু অর্থব্যয়ের অল্পাধিক সামর্থও আছে, সুতরাং তাঁহারা কৃষির অনেক উন্নতি করিতে পারেন, সেই সঙ্গে নিজ নিজ আর্থিক এবং সামাজিক অবস্থারও উন্নতি সাধন করিতে পারেন। ইঁহারা অনেক নূতন ও উন্নত প্রণালী পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করতঃ ক্ষেত্রকে যথেষ্ট ফলবতী করিতে পারেন। কেবল তাহাই নহে, তাহাদিগের কৃতকার্য্যতা অপরের পথ প্রদর্শক হইতে পারে। এই জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায় যত কৃষি-কার্য্যে মনোনিবেশ করেন তত দেশের মঙ্গল—সমাজের মঙ্গল। কিন্তু আশঙ্কার কথাটা না বলাও দোষের কথা। লেখকের পরিচিত প্রায় যতগুলি শিক্ষিত ও উৎসাহী ব্যক্তি কৃষিকার্য্যে হস্তক্ষেপন করিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে এ পর্য্যন্ত কাহাকেও বিশেষ সফলকাম হইতে দেখা যাইতেছে না—ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। তাঁহাদিগের বিফল্যের প্রধানতঃ দুইটি কারণ দেখা যায়, ১ম—ঔদ্ধত্য ও কার্য্যে অনভিজ্ঞতা ; ২য়—বৃহৎ ব্যাপারের সঙ্কল্প।

অশিক্ষিত কৃষকগণ চাষ-আবাদ করে, অতএব কৃষি বিষয়ে শিক্ষণীয় কিছু আছে, ইহা তাঁহারা ধারণা করিতে পারেন না, ফলতঃ অতি সহজ কার্য্য ভাবিয়া স্বকীয় ইচ্ছামত কার্য্যের

সূত্রপাত করেন, অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া অনর্থক কতকগুলি অর্থব্যয় করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন। কৃষিজীবীদিগের কৃষিকার্য্যের আয়-ব্যয় অনুমানিক ভাবে হিসাব করিয়া ইঁহারা সেই অনুপাতে বৃহৎ ব্যাপারের অবতারণা করেন কিন্তু ইহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, কৃষকদিগের অনুসৃত কার্য্য-প্রণালী কৃষির চরম কি না? কৃষকগণ নানা কারণে প্রকৃষ্ট প্রণালীর অনুসরণ করিতে পারে না ইহা সকলেরই জানা আছে, তথাপি আমরা উন্নত প্রণালীতে চাষ-আবাদ না করিয়া কৃষকদিগের প্রদর্শিত পথে বিচরণ করি কেন? কৃষকদিগের পথাবলম্বনে কৃষিকার্য্য করিতে হইলে আমরা কোনকালে সাফল্য লাভ করিতে পারিব না। এই কারণ বশতঃ আধুনিক কৃষিপথাবলম্বী গৃহস্থলোকে কৃষিকার্য্যে সফলকাম হইতে পারিতেছেন না! কৃষি কার্য্য করিতে হইলে আমাদিগকে দু'টী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। ১ম—বিস্তীর্ণ কৃষি, ২য়—প্রকৃষ্ট কৃষি।

বিস্তীর্ণ কৃষি।—বিস্তীর্ণ ভূমি খণ্ড লইয়া বৃহৎ ব্যাপারের সূচনা করা বিস্তীর্ণ কৃষির অন্তর্গত। কার্য্যক্ষেত্রের আয়তন বড় হইলে, তাহা হইতে অধিক অর্থের সমাগম হইতে পারে, ইহা সত্য কথা, কিন্তু বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যদি তদুপযোগী অর্থব্যয়, পরিশ্রম, পরিদর্শন প্রভৃতি না করিতে পারা যায়, তাহা হইলে অনুপাতিক হিসাবে যথেষ্ট লাভ হওয়া সম্ভব নহে। বিশ, পঞ্চাশ বা শত বিঘা জমি লইয়া চাষ-আবাদ করিলাম কিন্তু সেই আবাদের জন্য যথোচিত অর্থব্যয় বা পরিশ্রম করিতে পারিলাম না, এরূপ বিস্তীর্ণ কৃষি করিয়া লাভ কি? ক্ষেত্রের পরিমাণ দেখিয়া আবাদের ওজন বুঝা

যায় না, ফলন দেখিয়া আবাদের গুণাগুণ বিচার করিতে হইবে। ক্ষেত্রকে উত্তমরূপে কর্ষণ করিতে পারা গেল না, সুচারুরূপে বীজ বপন করিতে পারা গেল না, যথা সময়ে ক্ষেত্রের যথোচিত পরিচর্য্যা—নিড়ানী, জল সেচন, সার-প্রদান প্রভৃতি কত কার্য্য করিতে পারা গেল না, এতদবস্থায় পঞ্চাশ বা বিশ বিঘার আবাদ অপেক্ষা পাঁচ বিঘার প্রকৃষ্ট আবাদ কি শুভকর নহে? আশ্চর্য্য এই যে, লোকে কৃষির গূঢ়তত্ত্ব না বুঝিয়া বৃহৎ কার্য্যের অবতারণা করিয়া বসেন। ইয়ুরোপ বা আমেরিকার ন্যায় যে সকল দেশে বাষ্প বা তড়িৎ সাহায্যে কৃষিকার্য্য সমাহিত হইয়া থাকে, তথায় বিস্তীর্ণ কৃষির শোভা পায় এবং তথায় বিস্তীর্ণ কৃষি না করিলে কৃষিকার্য্যে সাফল্য লাভ করিতে পারা যায় না কিন্তু যে দেশের প্রজা সাধারণ গরীব, সেখানে বিস্তীর্ণ কৃষি আদৌ স্থান পাইতে পারে না। ভারতের বিশ বিঘা আবাদকে বিস্তীর্ণ আবাদ বলিতে হয়, কারণ উক্ত বিশ বিঘাকে আমরা যথাযথ ভাবে আধুনিক উন্নত প্রণালীতে আবাদ করিয়া উঠিতে পারি না। ভারতীয় ঈদৃশ বিস্তীর্ণ আবাদের আমরা আদৌ পক্ষ সমর্থন করিতে পারি না। ক্ষেত্রের প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চ মাটির যথাসাধ্য গভীর দেশ পর্য্যন্তকে উৎকৃষ্ট ভাবে কার্য্যোপযোগী করিতে না পারিলে আমাদিগের সমস্ত শ্রম, অর্থ ও সময় অনর্থক নষ্ট হইল—ইহাই মনে করা উচিত।

প্রকৃষ্ট কৃষি।—ক্ষেত্রের আয়তন বিস্তীর্ণ বা সঙ্কীর্ণ হউক, তাহা লইয়া আবাদের তারতম্য হয় না তাহা পুর্ব্বেই বলিয়াছি। যতটুকু ভূমিতে আবাদ করিতে হইবে তাহাতে ক্ষেত্রস্বামীর

তাবৎ উদ্যম, তাবৎ লোকবল, তাবৎ অর্থবল প্রয়োগ করিয়া যথাসাধ্য ফসল উৎপন্ন করিতে হইবে এবং এইজন্য অল্পায়তন জমিতে আবাদ করাই কর্ত্তব্য। প্রত্যেক বর্গ-ইঞ্চ ভূমি পূর্ণমাত্রায় ফসল প্রদান করিলে লাভের সীমা থাকে না, আনন্দেরও অবধি থাকে না। এস্থলে ইহাও জ্ঞাতব্য যে, অজস্র অর্থব্যয় করিলে যে যথেষ্ট হইল তাহা নহে। ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তির পরিমাণ বুঝিয়া সকল কার্য্য করাই যুক্তিসঙ্গত। বসুমাতা উর্ব্বরতার আধার, উৎপাদিকা তাঁহার আভরণ, তিনি কথনও মানুষকে ধন-রত্ন দিয়া, কথনও ধান্য গোধূম দিয়া পরিতৃপ্ত করেন সুতরাং কাহাকেও সেথানে বঞ্চিত হইতে হয় না। ক্ষেত্রে সিকি-দুয়ানি টাকা বা মোহর ছড়াইলে ধরিত্রীর সেবা হইবে না, তদীয় গর্ভে যে অফুরন্ত উৎপাদিকা আছে যাহাতে তাহার উদ্দীপনা হয়, তাহাই করিতে হইবে। ভূগর্ভে জলাভাব সংঘটিত হইলে পাছে চাষ-আবাদের অসুবিধা হয়, এই ভাবিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা বসুমাতাকে এত রসপ্লাবিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন, যে বিশ বৎসর বারিপাত না হইলেও ভূগর্ভের রস নিঃশেষিত হইবে না। সুকর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীর গভীরতম দেশ হইতে অনন্ত বারিধিকে উপরিভাগে উত্তোলিত করিলেও, কখনও জলাভাব হইবে না। ইতঃপূর্ব্বে বারম্বার বলিয়াছি যে, ভূপতিত একবিন্দু জলকে অপচয় হইতে দেওয়া কোনমতে কর্ত্তব্য নহে।

শুষ্ক আবাদের একটী বিশেষ অঙ্গ এই যে ভূগর্ভস্থ রস যাহাতে শুকাইয়া যাইতে না পারে, এজন্য কর্ষিত মাটিকে অল্পাধিক চাপিয়া দৃঢ়াবস্থায় রাখিতে হয়। মাটি আল্‌গা থাকিলে উপরিস্তরের মাটির সহিত ভূপৃষ্ঠভাগের সম্বন্ধ তিরোহিত হয়।

কর্ষণাদির পর এবং বীজ বপন করা হইলে ক্ষেত্রকে রুল অথবা গুরুভার চৌকী দ্বারা চাপিয়া দিয়া পরে তাহার উপর বিদা পরিচালনা করিতে হইবে। এই প্রকরণটী বিশেষ স্মরণ রাখা উচিত নতুবা নির্জ্জলা আবাদের সকল উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন হয় না।

সারের প্রয়োজনীয়তা।

অত্র পুস্তকের আরম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত কেবল ভূমি কর্ষণের কথাই পুনঃপুনঃ বলিয়াছি, ইহাতে পুনরুল্লেখ দোষ ঘটিয়া থাকিতে পারে কিন্তু বিষয়টী নিতান্ত গুরুতর বলিয়া সে দোষকে উপেক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছি। কর্ষণই কৃষির প্রধান কার্য্য সুতরাং তৎসম্বন্ধে যত অধিক করিয়া পাঠকের স্মৃতিগোচর করিতে পারি এই উদ্দেশ্যে কর্ষণ বিষয়ে একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়াছি। কর্ষণ ও তদানুসঙ্গিক অনেক বিষয় আমরা পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছি কিন্তু এস্থলে অবশ্যই বক্তব্য যে, কর্ষণই যে কৃষির প্রারম্ভ ও শেষ তাহা নহে। মাত্র ঔষধ সেবনে রোগীর ব্যাধি নিরাময় হয় না, সঙ্গে সঙ্গে সুপথ্যের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সেইরূপ ক্ষেত্রকে কেবল কর্ষণ করিয়া ছাড়িয়া দিলে চলে না, উহাতে সার প্রদান করা প্রয়োজন। এতক্ষণ সারবিষয়ক কোন কথা বিশেষ করিয়া বলি নাই বলিয়া এরূপ মনে করা উচিত নহে যে, কর্ষণাদির সুব্যবস্থা থাকিলে ক্ষেত্রে সার প্রদানের কোন প্রয়োজন নাই। আবাদ করিতে হইলেই ক্ষেত্রে সার প্রদান করিতে হইবে। ভূমিতে যত সার থাকুক, তাহা প্রতিনিয়ত খরচ হইতেছে। একদিকে যেরূপ খরচ হইতে

থাকে অন্যদিক হইতে ব্যয়িত উদ্ভিদ-খাদ্যের পরিপূরণ করিয়া না দিলে দিন দিন ক্ষেত্রস্থ উদ্ভিদ-খাদ্যের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং এই জন্য ক্ষেত্র ক্ষীণ হইয়া পড়ে, ক্ষেত্রের শস্যপ্রদায়িনী শক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে। ধরিত্রীগর্ভের গভীরতম দেশ পর্য্যন্ত উদ্ভিদখাদ্য বিদ্যমান থাকিলেও স্বল্পজীবী উদ্ভিদগণ তত নিম্নদেশে মূল প্রসারিত করিতে পারে না, কারণ প্রথমতঃ তাহাদিগের মূল তাদৃশ দীর্ঘ নহে; দ্বিতীয়তঃ স্বল্পজীবীবিধায় ততদূর মূল প্রসারিত হইবার সময় পায় না। এই জন্য ক্ষেত্রে সার প্রদান করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আহারীয় নিকটে থাকিলে উদ্ভিদগণকে তাহা আহরণ করিবার জন্য বিশেষ আয়াস বা ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না তন্নিবন্ধন তাহাদিগের জীবনীশক্তির বা উদ্যমের অপব্যয় হয় না। বিনাসারে ক্ষেত্র হইতে পুনঃপুনঃ অবিচ্ছিন্নভাবে ফসল উৎপন্ন করিয়া লইলে ক্ষেত্রের ক্ষতি হয়, ফসলের ক্ষতি হয়, ক্ষেত্রস্বামীর ক্ষতি হয়। এ সম্বন্ধে জর্ম্মান রসায়নবিদ্ ডাক্তার স্কুলটন সাহেব যাহা বলিয়াছেন তাহা জ্ঞান-প্রদ বলিয়া নিম্নে উদ্ধৃত হইল।*—

A certain Professor had a friend who died of cholera, and when it was found that he had caught the infection by drinking contaminated milk, the Professor decided to buy a goat, as a cow gave too much milk for his needs. He went to Kalighat where he knew that goats are sacrificed every day and rescued one from being killed

* "Soil Cultivation" by Dr. C. Schulten Ph. D., F. C. S., &c.

by the Hindus. He brought her to his room, on the roof of a house in the business quarter of the city and looked forward to obtaining a daily supply of unadulterated milk.

At the first everything was satisfactory; the milk was excellent, and all his fears about cholera, typhoid fever, etc., vanished.

The goat became his pet; he gave her a little fruit, such as *kelas*, etc., a little grass occasionally; he also built her a nice little hut. Now he was happy and life was again worth living.

By and by, however, he found that the quantity of milk was diminishing, and even that was not as good as at the beginning.

One morning he found, much to his surprise, the poor little goat dead in her hut. What was the cause of her death? He mourned for a day, and then it occurred to him that perhaps his servant who formerly bought the milk for him, and of course made some pice on the bargain had poisoned the goat, so that he must again rely on him to supply the milk. He, being a scientific man, went to the Veterinary Surgeon, taking the carcase with him, and asked for an examination

to see whether his supposition should prove to be correct. The Surgeon looked at the Professor, and asked him a lot of questions and soon found out that the wise man had regularly taken the milk, but, on the otherhand, had given no proper food to the poor little beast, not knowing that to take with one hand means to give with the other. It had not occured to him that a goat cannot give milk without nourishment. He went home a sadder and wiser man.

This is a true story and everybody will laugh at the Professor and think him rather a fool."

ইহার ভাবার্থ এই যে, কোন এক প্রোফেসরের একজন প্রোফেসর বন্ধু বিসূচিকা রোগে কালগ্রাসে পতিত হয়েন এবং পরে সিদ্ধান্ত হয় যে, মৃত প্রোফেসর দূষিত গোদুগ্ধ পান করায় মারা পড়েন। প্রথমতঃ প্রোফেসর ইহাতে ভীত হইয়া বাজারে দুগ্ধ ব্যবহার করা বন্ধ করিলেন। একাকীর প্রয়োজনাপেক্ষা অধিক দুগ্ধ প্রদান করিবে বলিয়া তিনি গাভী ক্রয় না করিয়া ছাগল ক্রয় করিবার মানসে কালীঘাটে গিয়া একটী ছাগল ক্রয় করিয়া আনিয়া তাহাকে লালন পালন করিতে থাকেন। ছাগলটী তাঁহার বড় প্রিয় হইয়া পড়িল এবং ক্রমে দুগ্ধ দিতে থাকিল, তিনিও প্রতিদিন নির্দ্দোষ নির্জ্জলা দুগ্ধ পাইতে লাগিলেন এবং তাঁহার বিসূচিকা প্রভৃতি রোগের ভয় তিরোহিত হইল। এইরূপে দিনকতক বেশ চলিতে লাগিল। অতঃপর

ক্রমে দেখিলেন যে, দুগ্ধের পরিমাণ হ্রাস হইতেছে এবং পূর্ব্ববৎ তেমন সুন্দর দুগ্ধ হইতেছে না। যাহাহউক, পরে একদিন প্রাতে সেই ছাগলটীকে সহসা মৃত দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং নিতান্ত সন্তপ্তভাবে একদিন অতিবাহিত করিয়া তাঁহার মনে সন্দেহ হইল যে, যে চাকর ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার জন্য বাজার হইতে দুগ্ধ ক্রয় করিয়া আনিত ফলতঃ কিছু লাভও করিত, হয় ত সে উক্ত পশুকে কোন বিষাক্ত খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। এই সন্দেহবশে তিনি উক্ত মৃত পশুটীকে জনৈক পশুচিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করাইবার জন্য লইয়া গেলেন। উক্ত চিকিৎসক তাঁহাকে কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন এবং তদুত্তরে বুঝিলেন যে, সুবিজ্ঞ প্রোফেসর নিয়মিতরূপে দুগ্ধ গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু ছাগল বেচারিকে যথাযোগ্য খাদ্যাদি দেন নাই কারণ ইহা তাঁহার বুদ্ধিতে ঘটে নাই যে, এক হস্ত দ্বারা লইতে হইলে অপর হস্ত দ্বারা প্রত্যর্পণ করিতে হয়। ইহাও তাঁহার মনে হয় নাই যে, পুষ্টিকর খাদ্য বিনা ছাগল দুগ্ধ প্রদান করিতে পারে না। এক্ষণে তিনি আরও দুঃখিত এবং আরও জ্ঞানী হইয়া গৃহে ফিরিলেন।

উপরের যে গল্পটী লিখিত হইল, তাহা কল্পনিক নহে, সত্য ঘটনা। ইহাই যে একমাত্র দৃষ্টান্ত তাহা নহে, কারণ এইরূপ ঘটনা সর্ব্বদাই সকলের চক্ষে পড়িতেছে। চাষ-আবাদে হউক বা পশুপালনে হউক, আমরা সর্ব্বদা হতাদর দেখিয়া আসিতেছি। এই জন্যই ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা হ্রাস পাইতেছে এবং তাহার অনিবার্য্য ফলে একদিকে ফসলের গুণবত্তার, অন্যদিকে ফলনের, হ্রাস হইতেছে সুতরাং কৃষককুল ধ্বংশোন্মুখ হইয়াছে। সেই ঔদাস্য বা

অক্ষমতা হেতু গৃহপালিত পশুগণ যথারীতি পানাহার ও সেবা পায় না, তন্নিবন্ধন তাহাদিগের কলেবর কৃশ হইয়া পড়িতেছে, বংশগণ ক্ষীণ, অকর্ম্মণ্য ও অল্পজীবী হইয়া পড়িয়াছে।

ক্ষেত্র হইতে যাহা কিছু ফসল গ্রহণ করি কিম্বা গাভী হইতে যে দুগ্ধ দোহন করি তাহার তাবদংশকে লাভ না ভাবিয়া ঋণ মনে করাই বিচক্ষণতা। লাভ—যে কোন প্রকারে ব্যয় করিতে পারা যায়, কিন্তু ঋণ সম্বন্ধে সে যুক্তি খাটে না, কারণ যাহা ঋণ, তাহা পাওনাদারকে অবশ্যই প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। ক্ষেত্র হইতে একটী তৃণ পর্য্যন্ত লইবার কাহারও ক্ষমতা বা অধিকার নাই, কারণ ভূগর্ভাস্তর্গত কোন পদার্থ ব্যক্তিবিশেষের নহে, উহা সৃষ্টিকর্ত্তার। গৃহপালিত পশুদিগের মধ্যে কোন পশু দোহন করিয়া আমরা দুগ্ধ গ্রহণ করি, কোন পশুকে শকটাদিতে যোজিত করিয়া আমরা কত কার্য্য সমাধা করিয়া লই। মানুষের ন্যায় ইহাদিগের প্রত্যেকটী স্বাধীন কিন্তু তাহাদিগকে আবদ্ধ রাখিয়া কেবলই যদি আমরা স্বীয় কার্য্যসাধন করিয়া লই, অথচ তাহাদিগের যথোচিত সেবা না করি তাহা হইলে সে কার্য্যটী কি সততামূলক হয়, না বিবেকানুমোদিত হয়? প্রকৃতপক্ষে এবং সরল বাঙ্গালায় তাহাকে চুরি ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। এ বিশাল সৃষ্টির প্রত্যেক ব্যাপারেই দান ও গ্রহণ এমনই সূক্ষ্মভাবে জড়িত যে, এক হইতে অন্যকে পৃথক করা যায় না, আর এই নিয়ম থাকাতেই বিশ্বের তাবৎ কার্য্য সুশৃঙ্খলে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। এই সামঞ্জস্যতা বা Balance ঠিক আছে বলিয়া ধরিত্রী ফসল প্রদান করিয়া তাবৎ জীবকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে পক্ষান্তরে জীবগণ সেই সকল পদার্থকে রূপান্তরিত করিয়া বসুমাতাকে

প্রত্যর্পণ করিতেছে। এ নিয়মের যে দিন বিপর্য্যয় ঘটিবে সেদিন পৃথিবী রসাতলে যাইবে। এতদর্থে আমরা দেখিব যে, অরণ্য ভূমি স্বভাবতঃ উর্ব্বরা হয় কেন ?

অরণ্যানী।—গাঢ় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাই যে, তথাকার ভূমিতে তাবৎ গাছপালা বহুকাল হইতে জন্মিতেছে। উক্ত উদ্ভিদদিগের কোন অংশই প্রায় কেহ সংগ্রহ করে না, ফলতঃ সকল পদার্থ অবশেষে ভূমিতে স্থান পায়। এইরূপ দীর্ঘকাল হইতেছে বলিয়া অরণ্যভূমির কোন ক্ষতি হওয়া দূরের কথা, বরং পুনঃ পুনঃ সার সঞ্চিত হওয়ায় উত্তরোত্তর কোমল ও সারবান হইয়া উঠিতেছে। এই জন্য ঈদৃশ আচোট ভূমি এতই সারাল থাকে যে তাহাতে কোন চাষ-আবাদ করিতে হইলে প্রথম প্রথম কয়েক বৎসর তাহাতে আদৌ কোন সার প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হয় না। আমরা অবগত আছি, ব্রহ্মদেশে আজকাল ভারতীয় লোক আমদানী ও বসত করাইয়া চাষ-আবাদ হইতেছে। সেই সকল আবহমানকালের অকর্ষিত ও অনাবাদী জঙ্গলভূমি এতই তেজাল যে, ভুট্টাদি ফসল একবার বাড়িয়া উঠিলে তাহাদিগের উপরিভাগ কর্ত্তন করিয়া গবাদি পশুদিগকে খাইতে দেওয়া হয়। এইরূপে একবার না কাটিয়া দিলে তাহাতে ভাল ফসল না হইয়া কেবল গাছেরই বৃদ্ধি হয়। আজ যে মাটি এত উর্ব্বরা, আবাদ করিতে করিতে ৫।৭ বৎসরে সে উর্ব্বরতার অনেক বিলোপ হইবে এবং বর্ত্তমান ও ভাবী ফসলের ফলনের তুলনা করিলে তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইবে। প্রকৃত অরণ্যানী যাহাকে বলে, সেরূপ জঙ্গল খাস-বাঙ্গালাদেশে নিতান্ত বিরল কিন্তু আসাম ও উড়িষ্যায় প্রচুর। সে সকল স্থানে

আবাদ হইতে এখনও বহু বিলম্ব আছে বলিয়া মনে হয়। অরণ্য ভূমি সমধিক উর্ব্বরা বলিয়া চা-বাগান সংস্থাপনোদ্দেশ্যে সাহেবরা নীবিড় ও গহন জঙ্গল গ্রহণ করিয়া থাকেন। এরূপ জমি লইয়া আবাদ করিতে বিপুল অর্থব্যয় করিতে হয়, কারণ সেই জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ভূমিকে আবদোপযোগী করা সহজ কথা নহে। তাহাও সাহেবেরা করেন সুতরাং যথেষ্ট অর্থোপর্জ্জন করিয়া কয়েক বৎসর পরে হাসিতে হাসিতে দেশে চলিয়া যান, আর বাঙ্গালী বসিয়া দেখে আর 'স্বদেশী' করে! আসাম ও উড়িষ্যায় এখনও সহস্র সহস্র বিঘা জমি জঙ্গলময় ও অনাবাদী অবস্থায় পতিত থাকিয়া শার্দ্দুলাদি পশুর আবাস স্থান হইয়া আছে। যাহাহউক, এতদ্দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, আবাদ করিতে করিতে ক্ষেত্রস্থ উদ্ভিদাহার ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। এতদ্ব্যতীত ইহাও আমরা দেখিতে পাই যে, ক্ষেত্রে সার প্রদান করিলে ক্ষেত্র সমধিক ফলবতী হয়, ফসলের গুণবত্তা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ক্ষেত্রে সার প্রদান করা যে একান্ত প্রয়োজন, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আর চেষ্টা করিতে হয় না। মৃত্তিকা মধ্যে যত কিছু পদার্থ থাকে—জৈব অজৈব নির্ব্বিশেষে—প্রত্যেক ফসলের সহিত তাহাদিগের কিছু-না-কিছু বহির্গত হইয়া যায়, তবে ফস্‌ফরস, পোটাস্ ও নাইট্রোজেন—এই কয়টী সামগ্রী উদ্ভিদগণের বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া এই কয়টী জিনিষই ক্ষেত্র হইতে অধিক খরচ হয়। প্রতি বৎসর ভারতবর্ষ হইতে চাউল, দ্বিদল, সর্ষপ, তিসি, বুট, গোধূম প্রভৃতি রাশি রাশি সামগ্রী জাহাজ বোঝাই হইয়া নানা দেশে চলিয়া যাইতেছে। তাহা ব্যতীত কদলীপেটীকা, মৃতপশ্বাদির অস্থি চর্ম্ম, অধিক কি নরপুরীষ পর্য্যন্ত জাহাজ বোঝাই হইয়া কত দেশ-

দেশান্তরে চলিয়া যাইতেছে! রপ্তানীতে দেশের ধনবৃদ্ধি হয় সত্য কথা, কিন্তু যদ্দ্বারা ভূমির উর্ব্বরতা রক্ষা হয় সে সমুদায় সামগ্রী রপ্তানী হইয়া গেলে দেশে যতই ধনরত্ন আসুক, দেশের মহা অকল্যান হয় এবং তাহাই হইতেছে! এই জন্য ভারতের মাটির উর্ব্বরতা হ্রাস পাইতেছে। অনেককে এরূপ অভিযোগ করিতে শুনিয়াছি যে, তাঁহাদিগের ফলকর বাগানের বৃক্ষগণ ভালরূপ বা সমধিক ফলপ্রদান করে না, গাছের বৃদ্ধি নাই ইত্যাদি। আবার ইহাও দেখিয়াছি, পল্লীগ্রামের অনেকের বাগানের তাবৎ স্খলিত পত্র স্তূপাকারে সংগ্রহ করা থাকে এবং সময়ে সময়ে স্থানীয় টিকাওয়ালাদিগকে বিক্রয় করা হয়। আবার অনেকে সেই সকল পত্রাদিকে গৃহস্থালী রন্ধনাদি কার্য্যের জন্য চুল্লীকে ভোগ দিয়া থাকেন। লেখক কখন সে প্রথার অনুমোদন করেন না, তিনি ঐ সকল পত্রাদিকে গাছের তলদেশ হইতে কখনও স্থানান্তরিত হইতে না দিয়া বরং যথাকালে ভূমিকুদ্দালনকালে মাটির ভিতর ঢাকিয়া দিতেন। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট দেখা গিয়াছে, অনেক শীর্ণ, বিবর্ণ গাছ সুন্দর পত্র সমন্বিত ও সুঠাম হইয়া উঠে, গাছের ফলন বৃদ্ধি পায়। এ প্রণালী অবলম্বন করিলে অর্থব্যয় করিয়া স্থানান্তর হইতে সার আনিয়া ক্ষেত্রে প্রদান করিবার তত প্রয়োজন হয় না। সম্বৎসর মধ্যে প্রত্যেক আম্র, কাঠাল বা লিচুগাছ গাছ হইতে যে পত্ররাশি ঝরিয়া পড়ে তাহা বড় অল্প নহে এবং প্রত্যেক গাছের পত্ররাশি গাছের তলদেশে স্থান পাইলে যথেষ্ট লাভ আছে কিন্তু লোকের অদূরদর্শিতা ও উদ্ভিদ পালনবিষয়ে অজ্ঞতা নিবন্ধন তৎসমুদায় স্থানান্তরিত হইয়া মৃত্তিকার দৈন্যতা আনয়ন করে। মাটি নিস্তেজ হইয়া পড়ে বলিয়া সময়ে সময়ে ক্ষেত্রকে জীর্ণ

দিবার প্রথা আছে কিন্তু ইহা যে বিশেষ ফলপ্রদ তাহা নহে, কারণ তদ্দ্বারা ক্ষেত্রে কোন সার সংযোজিত হয় না; মাটির মধ্যে যে সকল উদ্ভিদখাদ্য আপাততঃ আহরণের অযোগ্যাবস্থায় আছে, মাত্র তাহাকেই বিগলিত হইবার জন্য এবং সেই অবসরে রৌদ্র, বৃষ্টি, বায়ু প্রভৃতির সহযোগে মাটিকে অপেক্ষাকৃত কার্য্যকরী করিয়া লইবার জন্য এই প্রথা অবলম্বিত হয় কিন্তু যে পরিমাণ সামগ্রী পূর্ব্ববর্ত্তী ফসলের সহিত অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহার সহস্রাংশের একাংশও এতদ্দ্বারা ক্ষেত্রে সংযোজিত হয় না। জীরেণ না দিয়া ক্ষেত্রে সার প্রদান করায় সমধিক লাভ হয়। জীরেণ প্রথাকে একরূপ ক্ষতি মনে করা উচিত, কারণ জমির খাজানা, ফসলের মূল্য প্রভৃতি হিসাব করিলে জীরেণ পরে ফসলের ফলন দ্বারা তৎসমুদায় পরিপূরিত হইয়া লাভ থাকে কি না? ইহাপেক্ষা সার প্রদান করা সমধিক লাভের কথা।

সারের গুণ।—ক্ষেত্র সারাল হইলে তজ্জাত উদ্ভিদগণ অপেক্ষাকৃত শীঘ্র ও অধিক পরিপুষ্ট হয়, উদ্ভিদগণ দীর্ঘমূল ও বহুমূল হয়। এই জন্য সারাল ক্ষেত্রের উদ্ভিদ সহজে রসের অভাব অনুভব করে না, উপরন্তু অনেক রোগকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে। দৈন্যদশাগ্রস্থ ক্ষেত্রের ফসল বৃদ্ধিশীল হইতে পারে না, মূলেরও অল্পতা ও অদীর্ঘতা হেতু ভূগর্ভমধ্যে অধিক দূর হইতে রসাদি আহরণ করিতে সমর্থ হয় না। উপরিভাগের মাটিতে প্রচুর রস না পাইলে বৃদ্ধিরহিত হইয়া উদ্ভিদগণ অকাল বৃদ্ধ হইয়া পূর্ব্বাহ্নে মরিয়া যায় এবং তাহাতে যে ফসল উৎপন্ন হয়, তাহাও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর কিন্তু সার সংযুক্ত ক্ষেত্রের গাছ যেমন তেজাল ও ঝাড়াল হয়, তেমনি দীর্ঘজীবী হইয়া পূর্ণাবস্থা লাভ

করিবার পর ফসলোন্মুখী হয়। আবাদ্রকালে মাঠ-ময়দানে গেলে দেখা যায়, কোন কোন ক্ষেত্রের গাছ তেজাল, ঝাড়াল ও সুদীর্ঘ হইয়া শস্যভরে ভূশায়ী হইয়া পড়িয়াছে, আবার তাহারই সন্নিকটস্থ কত ক্ষেত্রে শীর্ণ, মড়াঞ্চেদশাপ্রাপ্ত গাছ ২।৪টী শীর্ষ ও কয়েকটী শস্য শিরে ধারণ করিয়া মৃত্তিকার দৈন্যতা প্রচার করিতেছে। সার প্রদান করিলে বহু ও উৎকৃষ্ট ফসল পাওয়া যায়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। গৃহপালিত গাভী যেরূপ যথেষ্ট ও পুষ্টিকর খাদ্যপানাদি পাইলে দৃঢ়কায় ও বলিষ্ঠ হইয়া প্রচুর দুগ্ধ প্রদান করে, যথাযোগ্য সার প্রদান করিলে উদ্ভিদগণও সেইরূপ ফসল প্রদান করিয়া থাকে। আমরা যাহা কিছু উদরস্থ করি তৎসমুদায়ই সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে মৃত্তিকাজাত পদার্থ। এজন্য ক্ষেত্রে যে সার দিলেই কাজ চুকিয়া গেল তাহা নহে, মাটিতে যে যে পদার্থসমূহের অল্পতা বা অভাব পরিলক্ষিত হয় এবং যে ফসল যে যে পদার্থ সমধিক গ্রহণ করিতে ভালবাসে তাহা বিবেচনা করিয়া সার নির্ব্বাচিত করিতে পারিলে সর্ব্বাংশে শ্রেয়স্কর হয়।

তাবৎ যুক্ত-সারই ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সম্বলিত এবং সেই সকল সারের মধ্যে যাহার প্রাধান্য বেশী তাহারই নামানুসারে সারের নামকরণ হয়। সোরা মধ্যে পোটাস ও নাইট্রোজেন থাকে কিন্তু শেষোক্ত পদার্থের প্রাধান্য হেতু উহা যবক্ষারজানজনিত সারের অন্তর্গত। অস্থিচুর্ণ বা ফস্‌ফেটীক্‌-সার মধ্যে ফস্‌ফেটিক পদার্থ, যবক্ষারজান, পোটাস, চুণ প্রভৃতি থাকিলেও উহা ফস্‌ফেটীক প্রধান বলিয়া ফস্‌ফেটীক সারের অন্তর্গত। খৈল গো, অশ্ব, মেষাদির নাদিও মিশ্রসার কিন্তু তৎসমুদায় যবক্ষারজান

প্রধান বলিয়া তজ্জাতীয় সার মধ্যে গণ্য, কিন্তু তাহা হইলেও অর্থাৎ কোন্ সার কোন্ জাতীয় তাহা জানা থাকিলেও প্রত্যেক সারের অন্তর্গত পদার্থ নিচয়ের পরিমাণানুপাত জ্ঞাত থাকা কর্ত্তব্য, কারণ তাহা হইলে ক্ষেত্রের মাটি মধ্যে কোন্ কোন্ পদার্থ আপাততঃ বিদ্যমান, এবং ভাবী ফসল কোন্ কোন্ পদার্থ কি পরিমাণে আহরণ করে, তাহা বুঝিয়া যথাযোগ্য সার প্রদান করিতে পারা যায়। সার প্রদানের ইহাই হইল বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। ইহাকে উপেক্ষা করিয়া যে-সে বা যত ইচ্ছা সার প্রদান করিলে ফসলের ক্ষতি হয়, আর্থিক ক্ষতিও যথেষ্ট হইয়া থাকে। অত্যধিক সার দ্বারা কোন ফসলের অত্যধিক বৃদ্ধি হয়, আবার কোন ফসলের তত সার প্রয়োজন না থাকায় সমূহভাগ অনর্থক নষ্ট হয়। এই সকল কারণবশতঃ ভূমির অবস্থা মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করা এবং সারের গুণাগুণ বিশেষরূপে অবগত থাকা উচিত। যথেচ্ছভাবে চাষ-আবাদ করিবার দিন অতিবাহিত হইয়াছে এবং সে প্রণালী অশিক্ষিত ও কৃষকগণের পক্ষে শোভা পাইতে পারে।

ক্ষেত্রে সার প্রদান করিবারও একটী রীতি-পদ্ধতি আছে। ক্ষেত্রে যে কোন সারই প্রদত্ত হউক, তাহা যত চূর্ণ, যত ধূলিবৎ মিহি হইবে তত তাহা শীঘ্র মাটির সহিত সর্ব্বত্র সমভাবে মিশিবে। প্রায় দেখা যায়, লোকে সার প্রসারিত করিবার জন্য বড় একটা যত্ন করে না। ইহাদিগের প্রণালীমতে ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে সারের স্তূপ প্রথমতঃ সঞ্চিত হয়। উক্ত স্তূপ সমূহের সার কতক চূর্ণ ও ঝুরা থাকে, আবার কতক ছোট-বড় ঢেলার আকারে থাকে। এই অবস্থায় কয়েকদিবস হইতে কয়েক সপ্তাহ ক্ষেত্রে

* মৎকৃত "উদ্ভিদ-খাদ্য" দেখুন।

অনাবৃত পতিত থাকিয়া তদন্তর্গত জলীয়ভাগ শুকাইয়া যায়। বলা বাহুল্য, উক্ত জলীয় ভাগই উদ্ভিদের সদ্য আহরণোপযোগী পদার্থ অতঃপর শুষ্ক হওয়ায় সারান্তর্গত ছোট-বড় ঢেলা সমূহ কঠিন হইয়া যায় ফলতঃ পরে মাটির সহিত ভালরূপে সংমিশ্রিত হয় না, সারেরও সমবিস্তার হয় না। ক্ষেত্রের সমগ্র মাটিতে সার সূক্ষ্মভাবে ও সমভাবে মিশ্রিত না হইলে ক্ষেত্রের স্থান-বিশেষ অধিক সারাল হয়, আবার অনেক স্থানে অল্প সার পতিত হয়, তন্নিবন্ধন ক্ষেত্র ব্যাপিয়া সর্ব্বত্র উদ্ভিদগণ সমবৃদ্ধিশীল হয় না, ফলতঃ ফলনের ইতরবিশেষ হয়। ক্ষেত্রকর্ষণকালে মৃত্তিকাকে যেরূপ উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া দিবার প্রথা আছে, সারকে সেইরূপে সুচূর্ণীত ও সমভাবে প্রসারিত করিয়া না দিলে মাটি দৃঢ় না হইয়া ফাঁপা থাকে, মাটির মধ্যে অধিক বায়ু পরিচালিত হইতে থাকে, রৌদ্রে মাটি শুকাইয়া যাইতে থাকে ইত্যাদি অনেক দোষ ঘটে। তাহা ব্যতীত উদ্ভিদমূলগণ মাটির সহিত ঘনভাবে আবদ্ধ না হইয়া আল্গা থাকে, তাহাতেও অনেক দোষ ঘটে তাহা প্রস্তাবান্তরে উক্ত হইয়াছে।

ঈষৎ গভীর কর্ষণের পরে সারকে উল্লিখিত প্রক্রিয়ানুসারে চূর্ণ করতঃ মাটির সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া দিলে মাটি ও সার একাঙ্গ হইয়া যায়, তন্নিবন্ধন সার অপেক্ষাকৃত শীঘ্র বিগলিত হইতে থাকে, তাহা ব্যতীত সারের কোন অংশ অপচয় হইতে পায় না।

দীর্ঘমূল ও নিম্নস্তর।—গভীর ভূকর্ষণ দ্বারা আবাদ করা সকলের পক্ষে সাধ্যায়ত্ত নহে। তাহা ব্যতীত, এদেশবাসী এখনও বহুমূল্য যন্ত্রাদি সাহায্যে চাষ-বাস করিতে শিখে নাই, করিবার সামর্থও নাই। এই জন্য অন্য উপায় দ্বারা ভূমির নিম্ন-

স্তরকে প্রকারান্তরে (Mechanically) আল্গা ও সারাল অবস্থায় রাখিতে চেষ্টা করা উচিত কিন্তু তাহা হইলেও মূল সূত্র বা মূল উদ্দেশ্যটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। ক্ষেত্রে সার প্রদান দ্বারা সাক্ষাত্তাবে আমরা দেখিতে পাই—ফসলের শ্রীবৃদ্ধি হয়, ফলন অধিক হয়। ঈষৎ গভীরভাবে ভাবিয়া দেখিলে সারপ্রদানের আরও অনেক উপকার উপলব্ধি হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সার সংযোগ হেতু উদ্ভিদের মূল দীর্ঘ ও বহু হয়। মূলের দীর্ঘতা ও বহুত্ব হেতু নিম্নস্তরের মাটি কর্ষিত না হইলেও আল্গা থাকে, কারণ ফসল সংগৃহীত হইলেও স্থূল-সূক্ষ্ম বহু মূল ভূগর্ভে থাকিয়া যায়। সেই সকল উদ্ভিজ্জাবশিষ্ট রহিয়া যাওয়ায় মাটি যে কেবল আল্গা থাকে, তাহা নহে, মাটি সারালও হয়। এই জন্য মধ্যে মধ্যে দীর্ঘমূল ফসলের আবাদ করায় গভীর কর্ষণের ফল পাওয়া যায়। সম্বৎসর মধ্যে ক্ষেত্রে যে কয়টী ফসলের আবাদ হয় তাহার মধ্যে পর্য্যায়ের নিয়মানুসারে কোন কোন দীর্ঘমূল ফসলের আবাদ করিলে সে উদ্দেশ্য বহু পরিমাণে সুসিদ্ধ হয়। যাহা হউক, ইহা মনে করা বড় ভুল যে, ক্ষেত্র হইতে ফসল সংগৃহিত হইলেই সারের সহিত সম্বন্ধ মিটিয়া গেল।

বহু সার।—ক্ষেত্রে সার প্রদান করা যেরূপ একান্ত প্রয়োজন, সেইরূপ বহু সারও নিতান্ত দোষাবহ। বহু সার প্রদান করিলেই যে প্রভূত ফসল উৎপন্ন হইবে, তাহা নহে। যে উদ্ভিদের যে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন, সে তাহাই আহরণ করে, অতিরিক্তাংশ ভূমিতেই থাকিয়া যায়। যে অবস্থায় সার ক্ষেত্রে প্রদত্ত হয়, ফসল উঠিয়া গেলেও যদি উদ্বৃত্ত সারাংশ তদবস্থাতেই যথাযথভাবে থাকে, তাহা হইলে ক্ষতির কোন কারণ নাই, বরং তদ্দ্বারা পরবর্ত্তী

ফসলের উপকারই হয়, কিন্তু তাহা না হইয়া উদ্বৃত্তাংশ দিন দিন জীর্ণ হইয়া ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়, সারান্তর্গত জলীয় ও বাষ্পীয় ভাগ শুকাইয়া যায়। এই সকল কারণ বশতঃ ক্ষেত্রে সার প্রদান করা একটী বিচক্ষণতার কার্য্য। ক্ষেত্রের বর্ত্তমান শক্তির সহিত ভাবী ফসলের প্রয়োজনীয়তার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যথা পরিমাপ ও যথাযোগ্য সার প্রদান করাই স্পৃহনীয়। ক্ষেত্রের শক্তি, মৃত্তিকার গঠন বা উপাদান-সমাবেশ প্রভৃতির বিষয় অবগত না হইয়া ফসল বিশেষের জন্য লোককে একটা সারের ব্যবস্থা প্রদান করা নিতান্ত হটকারিতার পরিচায়ক। প্রকৃতই যাঁহারা স্বকীয় তত্ত্বাবধানে কখনও কৃষি-কার্য্য করিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকে এ তত্ত্ব অবগত নহেন যে, ক্ষেত্র, মৃত্তিকা ও ফসল—এই তিনটী বিষয় বিবেচনা করিয়া সার নির্ব্বাচন করিতে হয়, সারের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে হয়। এ সকল বিষয় বিবেচনা না করিয়াই অনেক উপদেষ্টাকেও এই ভাবে উপদেশ দিতে দেখা যায়। সকল মাটি সমগুণ সম্পন্ন হইলে, সকল মাটির উপাদানে প্রভেদ না থাকিলে, কিম্বা সকল ফসলের অভাব প্রয়োজন মধ্যেও তারতম্য না থাকিলে কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ প্রয়োগের ব্যবস্থা করিলে ক্ষতির কারণ নাই।

মাটি পরীক্ষার জন্য স্থূলতঃ কয়েকটী সঙ্কেত জানিয়া রাখা সকল কৃষিকর্ম্মনিরত ব্যক্তির পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য। মাটির বর্ণ যত সাদাটে হয়, মাটির কণাসমূহ যত স্থূল হয়, মাটি যত জল ধারণে অক্ষম, সে মাটি তত বালুকা-প্রধান জানিতে হইবে। তাহা ব্যতীত ঈদৃশ মাটি সরস অবস্থাতেও মুষ্টি মধ্যে আবদ্ধ হইলে দলবদ্ধ না হইয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। আটাল মাটির প্রকৃতি

বালি মাটির ঠিক বিপরীত, কারণ তাহার বর্ণ অল্পাধিক মসি সদৃশ, কণাসমূহ সূক্ষ্ম, সরস অবস্থায় মুষ্টিবদ্ধ হইলে জমাট বাঁধে, অধিক জল পাইলে পিচ্ছিল হয়। শুষ্কাবস্থায় তাহাতে জল সঞ্জাত হইলে সোঁদা গন্ধ বাহির হয়। উক্ত মাটি সমধিক রসধারক। এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী মাটিকে দোয়াঁশ মাটি কহে। ইহাতে সমধিক পরিমাণে উদ্ভিজ্জ পদার্থ বিদ্যমান বলিয়া স্বভাবতঃ কোমল ও স্থিতিস্থাপক হয় এবং অধিক জলধারণে সক্ষম। সচরাচর ইহা পিঙ্গলবর্ণের হয়। যাহা হউক, ক্ষেত্রে সার সংযোজিত হইলে যখন আমরা সত্বই তাহার সুফল প্রাপ্ত হই তখন সে বিষয়ে অবজ্ঞা বা অবহেলা করা সঙ্গত নহে। আমরা কৃষিসৌকর্য্যার্থে যে পরিমাণে অর্থাদি ব্যয় করি তাহাপেক্ষা যে আমরা কম বা নিকৃষ্ট ফসল আহরণ করি তাহা নহে। লোকে চাহে বিনা অর্থব্যয়ে, বিনা পরিশ্রমে, ঘর ধন-ধান্যেপূর্ণ হউক, কিন্তু তাহা হয় না, হওয়া সম্ভব নহে এবং তাহা স্পৃহনীয়ও নহে। পাশ্চাত্যদিগের চাষ-আবাদের বিপুল ফলন দেখিয়া, গাভীদিগের দুগ্ধ প্রদানের অসাধারণ শক্তি দেখিয়া, আমরা বিমুগ্ধ হই। কিন্তু ইহার মধ্যে বিস্ময়ের কিছুই নাই। আমরাও ক্ষেত্রকে সেই মত সারবতী ও ও উর্ব্বরা করিতে পারিলে আমাদিগের ক্ষেত্রও সুবর্ণপ্রসবিণী হইতে পারে তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। সার যে উদ্ভিদ-খাদ্য ভিন্ন আর কিছু নহে, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত। ক্ষেত্রকে আমরা বহুকাল হইতে শোষণ করিয়া আসিতেছি কিন্তু এক্ষণে মাত্র শোষণ করিলে চলিবে না। "To take with one hand means to give with the other" এই বহুমূল্য শিক্ষাটী মনে রাখিতে হইবে। প্রতিবার ফসল সংগৃহীত হইবার পর

প্রয়োজন মত অল্পাধিক সার ক্ষেত্রে সংযোগ করিতেই হইবে, তবেই মাটির 'জান' থাকিবে,—মাটির উর্ব্বরতা অটুট থাকিবে। এই জন্য স্থানান্তরে উক্ত হইয়াছে যে, অল্প জমিতে উত্তম পদ্ধতিমত আবাদ করিতে হইবে। বিনা বা সামান্য খরচায় চাষ-আবাদে তদনুরূপই ফল পাওয়া যাইবে সুতরাং সেজন্য সন্তপ্ত না হইয়া শান্ত থাকাই ভাল।

আদর্শ কৃষি।

—:০:—

শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে কৃষিকার্য্য করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে পুরাতন পদ্ধতির অনুসরণ করিলে চলিবে না, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সাধারণ শ্রমজীবী ও কৃষকগণ-অনুসৃত কার্য্যপ্রণালী আদর্শ-কৃষির লক্ষ্য হইতে পারে না। ইহারা নাম মাত্র মূলধন লইয়া কাজ করে, অনেক সময়ে তাহাও ঋণ করিয়া সংগ্রহ করে। ঈদৃশ অবস্থায় তাহারা অল্প আয়ে সন্তুষ্ট হইতে পারে। ক্ষেত্র হইতে সহজে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাকেই তাহারা যথেষ্ট মনে করে। এতদ্ব্যতীত তাহাদিগের বোধ হয় এমন কখনও মনে হয় না যে, প্রকৃষ্ট প্রণালীতে আবাদ করিলে অধিক লাভ হইতে পারে। তাহাদিগের যে আয় হয়, তাহাতে প্রায় অধিকাংশ স্থলে দেখা যায়, বৎসরের প্রারম্ভ হইতে শেষ অবধি সুশৃঙ্খলে দিনপাত হয় না। এই জন্য তাহাদিগকে সময়বিশেষে

জন-মজুরীর কাজে যাইতে হয় সুতরাং কৃষিই যে তাহাদিগের একমাত্র অবলম্বন তাহা নহে, অন্যতম উপায় মাত্র। শিক্ষিত ও গৃহস্থদিগকে কৃষিকার্য্য করিতে হইলে একমাত্র কৃষিকার্য্যেই সমগ্র সময় অতিবাহিত করিতে হইবে। যাহাতে ৩৬৫ দিন সমভাবে কাজ করিতে পারা যায়, যাহাতে কোন দিনও কার্য্যাভাবে আলস্যে কাটাইতে না হয়, এরূপ ব্যবস্থা করিয়া কার্য্যের আয়োজন করিতে হয়। নিকৃষ্ট যন্ত্রাদি সহযোগে, নিকৃষ্ট প্রণালীতে কাজ করা কোন মতে বিধেয় নহে।

উন্নত কৃষির প্রধান অঙ্গ—উত্তম কর্ষণ। এতদ্দ্বারা গভীর-কর্ষণ বুঝিতে হইবে, কিন্তু কর্ষণ কত গভীর হওয়া উচিত তাহা ক্ষেত্র-স্বামী নিজে নির্দ্ধারিত করিতে পারেন ইহাই স্পৃহনীয়। সাধারণতঃ ৮।৯ ইঞ্চ গভীর কর্ষণ অনায়াসে হইতে পারে কিন্তু তাহা হইলেও দেশী হাল-বলদ বর্জ্জন করিয়া গভীর-কর্ষক হালই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। কুদ্দালিত করিলে ভূগর্ভের নিম্নস্তরও বিড়ম্বিত হয় সত্য, কিন্তু তাহাতে নিম্নদেশের মাটির যথোপযুক্ত পরিচর্য্যা হয় না। গভীর-কর্ষক হালদ্বারা ৮।৯ ইঞ্চ মাটি বিচলিত হয় এবং ফালটী হস্তীকর্ণ বলিয়া তাবৎ কর্ষিত মাটি পার্শ্বদেশে একবারে উল্টাইয়া পড়ে। এতদর্থে Turn wrist plough বিশেষ কার্য্যকরী কিন্তু উক্ত হাল প্রবাহিত করিবার জন্য দৃঢ়কায় ও ঈষদুচ্চ বলদের প্রয়োজন। শীর্ণ ও অনুচ্চ বলদ দ্বারা উক্ত হাল চালিত হওয়া দুষ্কর। কিন্তু এতদুভয়ই ব্যয়সাপেক্ষ সুতরাং কৃষকগণ দ্বারা তাহা অবলম্বিত হওয়া আপাততঃ সুদূরপরাহত বলিয়া মনে হয়। কেবল হাল-বলদ নহে, তাবৎ যন্ত্র ও অস্ত্র স্থায়ী দৃঢ় ও তীক্ষ্ণধার হওয়া প্রয়োজন এবং প্রয়োজন মত

তাহাদিগকে সংস্কার করিয়া লওয়া উচিত। এত কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, সকল কার্য্যই শীঘ্র ও সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হওয়া প্রয়োজন, কারণ লাভ বা ক্ষতি—ইহার উপরে অনেকটা নির্ভরপর। যন্ত্রাদি উত্তমাবস্থায় থাকা যেরূপ স্পৃহনীয়, বলদগণ যাহাতে বারোমাস স্বাস্থ্যবান ও বলিষ্ঠ থাকে সে বিষয়ে সতত দৃষ্টি রাখা তেমনি প্রয়োজন।

অতঃপর—কর্ষণ। তৎসম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনেক আলোচনা [illegible]গাছে। গভীর-কর্ষণের পর মাটিকে এক দফা বেশ কা[illegible] [illegible]পিয়া দিতে হয়। ইহাকে Sub-soil Packing কহে। এ দেশে এখনও উক্ত কার্য্যের জন্য Packer নামক যন্ত্র আইসে নাই, মার্কিনরাজ্যে ইহার খুব প্রচলন হইয়াছে ক্যাম্বেল সাহেব ইহার প্রবর্ত্তক। যাহা হউক, লৌহ বা কাষ্ঠনির্ম্মিত রুলদ্বারা ভূপৃষ্ঠকে চাপিয়া দিলে অন্তর্ভূমি অল্পাধিক দৃঢ় হয়, তন্নিবন্ধন ভূগর্ভ হইতে রস উপরিভাগে উঠিতে থাকে ও অন্যান্য অনেক কার্য্য হয় তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অতঃপর পুনরায় বীজ বা গাছ রোপণ করিবার জন্য লঘুভাবে হলচালনা করিতে হয়। রোপিত হইলে যথানিয়মে ক্ষেত্রোপরি মদিকা বা চৌকী দিয়া মাটিকে সমতল করিয়া চাপিয়া দিতে হয়। মাটিতে রস সরবরাহ রাখিবার জন্য এক্ষণে ভূপৃষ্ঠে 'চাদর' (Mulch) করা প্রয়োজন। এতদর্থে বিদে ব্যবহার করাই উচিত। নিতান্ত শুষ্ক ও বা নিতান্ত ভিজে মাটিতে ভাল 'চাদর' হয় না, ঈষৎ সরস মাটিতে বিদা পরিচালিত করিলে উত্তম চাদর উৎপন্ন হয়। নিতান্ত ঝুরা ও মিহি মাটি হইলে একপসলা বারিপাতেই সমগ্রক্ষেত্র সমতল হইয়া যায়, অধিকক্ষণ বৃষ্টি হইতে থাকিলে মাটি আর জলশোষণ করিতে

পারে না, তাহা ব্যতীত ২।৩ দিন মধ্যে পুনরায় উস্কাইয়া না দিলে পৃষ্ঠদেশ পূর্ব্ববৎ হয় না, কিন্তু ঈষৎ সরস অবস্থায় হাল, চৌকী বা বিদে প্রবাহিত হইলে সর্ষপ দানা হইতে সুপারি বা আমড়ার আকারের ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহু ঢেলা উৎপন্ন হয়, ইহাই হইল উত্তম চাদর। এতদ্দ্বারা চাদরের নিম্নস্থ মাটি সর্ব্বদা সরস থাকে। বৃষ্টির পর যখনই মাটির যো হইবে তখনই, কালবিলম্ব না করিয়া, ভূপৃষ্ঠকে চাদরিত করিয়া দিতে হইবে।

যো শব্দটী একবর্ণের হইলেও কৃষির একটী বিশেষ—ক্ষণ। উহাকে শুভক্ষণ বা শুভলগ্ন বলা যাইতে পারে। উক্ত শুভক্ষণের জন্য প্রতীক্ষা করিতে হয় কারণ উহা অধিকক্ষণ স্থায়ী নহে। যো আরম্ভ ও শেষ এক মুহূর্ত্ত ব্যাপী। যো'র পূর্ব্বে বা পরে মৃত্তিকা বিচলিত হইলে ঠিক মনোমত কাজ হয় না, কিন্তু উহা এত অল্পব্যাপী বলিয়া কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতে পর পর্য্যন্ত সময় লইয়া কার্য্য সমাধা করিতে হয়। দুর্গোৎসবে সন্ধি-পূজার জন্য লোকে যেরূপ পূর্ব্ব হইতেই উদ্যোগ আয়োজন সহযোগে কার্য্যারম্ভ করে এবং সেই শুভলগ্ন উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও পূজাদি কার্য্য চলিতে থাকে, যো'কালে ভূমির পরিচর্য্যা সেইরূপ। যো'কে কোন মতে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে দিতে নাই, ইহাই হইল স্থূল কথা। যো-মুখে হলচালিত হইলে কৃষাণের বা বলদের কষ্ট হয় না, মাটি সহজে বিচলিত হয়, সিক্ততাহেতু ফালে কর্দ্দম সঞ্চিত হইয়া পরিচালনার ব্যাঘাত করে না, কিম্বা শুষ্কতাহেতু কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করিতে কৃষাণ বা বলদকে সমধিক বলপ্রয়োগ করিতে হয় না ইত্যাদি অনেক কার্য্যের সুবিধা হয়। উত্তীর্ণ যোয়ে ভূমিকে বিচলিতরিলেক বড় ও শক্ত বিস্তর ঢেলা উৎপন্ন হয় এবং

পুনঃ পুনঃ হলচালনাদিতে তাহা সহজে ভাঙ্গেনা বরং যত বাতাস ও রৌদ্র সংস্পর্শিত হয় ততই কঠিন হইয়া পড়ে। মই বা চৌকী দ্বারা এই সকল ঢেলা প্রায় মাটির মধ্যে ঢাকিয়া যায় কিন্তু সামান্য বৃষ্টি হইলেই উপরিভাগের সূক্ষ্ম মাটি বসিয়া গেলে সেই সমুদায় ঢেলা প্রকাশ পায়। ক্ষেত্রে ঢেলা উৎপন্ন হইলে তৎসমুদায়কে উপেক্ষা না করিয়া মুদ্গর সাহায্যে চূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। মুদ্গরণ কাহাকেই অবলম্বন করিতে দেখা যায় না। বেহারের নীলকরগণ কিন্তু ক্ষেত্রসমূহকে মুদ্গরিত করেন। লেখকও মুদ্গরণ কার্য্যকে ক্ষেত্রকর্ষণের একটী বিশেষ অঙ্গ মনে করেন। এতদর্থে তাঁহার অধীনে কতকগুলি বালক ও স্ত্রীলোক থাকিত, এবং যেখানেই ক্ষেত্রকর্ষণ হইত সেইখানেই তাহারা উপস্থিত থাকিয়া হলচালনার পরেই মুদ্গর সাহায্যে ক্ষেত্রস্থিত সমুদায় ঢেলাকে চূর্ণ করিয়া দিত।

সার।—উত্তম কৃষির বিশেষ উপকরণ সার। প্রকৃতপক্ষে সার কি? ক্ষেত্রে সার দিতে হয় বলিয়া আমরা সার খরিদ করি ও ব্যবহার করি কিন্তু সার কি তাহা কয়জন ভাবিয়া দেখেন? সারের প্রকৃত অর্থ বিদিত থাকিলে সার যে কত প্রয়োজনীয় তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। সারের প্রকৃত অর্থ—উদ্ভিদখাদ্য।* উদ্ভিদখাদ্য স্বভাবতঃ ভূগর্ভমধ্যে কতক বিদ্যমান থাকে, আবার ক্ষেত্রস্বামীগণ উদ্ভিদকে যথোচিত বা প্রভূত পরিমাণে খাদ্য সরবরাহ করিবার জন্য কৃত্রিম উপায়ে ক্ষেত্রে নানাবিধ সামগ্রী প্রদান করিয়া থাকেন। সারের মধ্যে উদ্ভিদের খাদ্যোপযোগী

* মৎকৃত "উদ্ভিদখাদ্য" নামক পুস্তক দেখুন।

পদার্থসমূহের ইতরবিশেষে উহার গুণবত্তার তারতম্য হইয়া থাকে। আমরা জল, দুগ্ধ প্রভৃতি পান করি, অন্ন আহার করি, দ্বিদলও আহার করি, কিন্তু জল, দুগ্ধ, অন্ন বা দ্বিদল এক পদার্থ বা সমগুণ বা সমশক্তিসম্পন্ন নহে। সেইরূপ, সকল উদ্ভিদখাদ্য সমগুণসম্পন্ন নহে—ইহা স্মরণ রাখিলে সার নির্ব্বাচনে বা সার প্রদানে অনেক সুবিধা হয়, নতুবা অনাড়ির ন্যায় সারকে উদ্ভিদখাদ্য না ভাবিলে অনেক সময় ক্ষেত্রে সার প্রয়োগের ফল ব্যর্থ হয়।

যে কোন উদ্ভিদখাদ্য ক্ষেত্রে প্রদত্ত হউক, ভৌতিক ক্রিয়াবশে সূক্ষ্মভাব ধারণ করিলে তবে তাহা উদ্ভিদের আহরণোপযোগী হয়। চাউল, দ্বিদল, তরি-তরকারি প্রভৃতি অগ্নিপক্ব ও সুসিদ্ধ না হইলে আমরা যেরূপ তৎসমুদায়কে ভোজন করিতে পারিতে পারি না, সেইরূপ তাবৎ উদ্ভিদ জল, কার্ব্বনিক য়্যাসিড ও য়্যামোনিয়া রূপে খাদ্য দ্রব্যসমূহ আহরণ করে। উক্ত তিনটী পদার্থ ভিন্ন উদ্ভিদগণ অন্য কোনরূপে কোন পদার্থকে গ্রহণ করিতে পারে না। এই জন্য ক্ষেত্রে যে কোন সার প্রদত্ত হউক তাহা সুচূর্ণীকৃত হওয়া প্রয়োজন। তাহা ব্যতীত সেই পদার্থ নিচয় মাটির সহিত অতি সূক্ষ্মভাবে মিশিয়া যাওয়া চাই। মৃত্তিকাকণাসমূহের সহিত সার যত ঘনভাবে মিশিয়া যাইবে তত শীঘ্র তাহা কার্য্যকরী হইবে, তত অধিক উপযোগী হইবে। এইরূপে মিশ্রিত হইলে পূর্ব্বোল্লিখিত পদার্থগণ রসের সহিত মিশিয়া উদ্ভিদ মধ্যে প্রবেশ লাভ করিবে, তবেই সার প্রদানের ফল দেখা যাইবে।

সার প্রদানের পর তদন্তর্গত পদার্থ সমূহের কাঠিন্য বা বা কোমলতা অনুসারে অল্পাধিক কাল বিগত না হইলে উহা

উদ্ভিদ-মূলগণ গ্রহণে সমর্থ হয় না, এই জন্য আমরা হাতে-হাতে ফল দেখিতে পাইনা, তবে প্রস্তুত-উদ্ভিদখাদ্যরূপে প্রদত্ত হইলে স্বতন্ত্র কথা। জলীয় সার প্রদান করিলে দুই একদিন মধ্যে একটী বিশেষ পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়, কারণ উহার অন্তর্গত অনেক পদার্থ উদ্ভিদের আহরণোপযোগী অবস্থা ইতিপূর্ব্বেই পাইয়া থাকে। য়্যামোনিয়া বা কার্ব্বনিক য়্যাসিড বা জল উদ্ভিদমূলগণ সদ্য আহরণ করিতে সমর্থ। এই জন্য ভাবী ফসল-পত্তনের কিছুদিন পূর্ব্বেই ভূমিতে সার প্রদান করিতে হয়। অস্থিচূর্ণের ন্যায় মোটা ও কঠিন সার ২।৩ মাস পূর্ব্বে দেওয়া উচিত।

অনন্তর মাটির উর্ব্বরতার এবং সারের ইতরবিশেষ বুঝিয়া তবে অল্প বা অধিক সার প্রদান করিতে হয়। তাহা ব্যতীত, কোন্ উদ্ভিদখাদ্য মাটিতে দিলে ভাবী ফসলের উপকার হইতে পারে তাহাও বিবেচনা করিবার বিষয়। অবিবেচনাসহ অযথা-ভাবে অতিরিক্ত সার প্রদান করা উচিত নহে, কারণ উদ্ভিদগণ নিজ নিজ প্রয়োজন ও শক্তি অনুসারে উহা আহরণ করে। এজন্য একেবারে বহু সার না দিয়া ২।৩ বার অল্প পরিমাণে দিলে অধিক কাজ হয় এবং অপেক্ষাকৃত অল্প সারে কার্য্য সমাহিত হইতে পারে। একবারে অধিক সার প্রদত্ত হইলে উদ্ভিদগণ হয় তাহা গ্রহণ করিতে পারে না, কিম্বা অতিরিক্ত গ্রহণ করিয়া রুগ্ন হইয়া হইয়া পড়ে। আদর্শ-কৃষির অন্যতম উপকরণ।—

সুবীজ।—যেমন বীজ তদনুরূপ ফসল—ইহা সর্ব্ববাদী-সম্মত কথা। বীজ নিকৃষ্ট হইলে যত ভাল জমি হউক, যত উত্তম সার দেওয়া যাউক কিছুতেই ভাল ফসল জন্মে না কিন্তু বীজ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আমরা নিতান্ত হতাদর করি বলিয়া

আমাদিগের তাবৎ ফসল,—কি ফল-পাকুড়, কি তরি-তরকারি, আর কি মেঠো-ফসল,—দিন দিন নিকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছে। ক্ষেত্রের ফলন হ্রাস হইবার ইহাও একটী বিশেষ কারণ। একদিকে যেরূপ ভাল বীজ বপন স্পৃহনীয়, অন্যদিকে ভাল বীজ উৎপন্ন ও সংগ্রহ করা তদপেক্ষা অধিক প্রয়োজন, কারণ ভাল বীজ সংগৃহিত হইলে তাহা ফেলিয়া কেহ নিকৃষ্ট বীজ ব্যবহার করে না ইহা নিশ্চয়।

সুবীজের লক্ষণ কি?—বীজের বাহ্যাকৃতি প্রীতিকর ও পরিপুষ্ট হইলে, সাধারণতঃ ভাল বীজ হয়। তাহা ব্যতীত বীজগুলি কীটদংষ্ট, ছাতাধরা বা দুর্গন্ধময় না হয় তাহাও দেখিতে হইবে। বীজের বাহ্যাকৃতি মধ্যে কোন দোষ না দেখিতে পাওয়া গেলেও অনেক সময় বীজ অঙ্কুরিত হয় না তাহার প্রথম কারণ অজ্ঞাতসারে কোন প্রকারে ঠাণ্ডা লাগিলে বীজমধ্যস্থ ভ্রূণ সংগোপনে স্ফীত হয়, কিন্তু অঙ্কুরিত হইতে না পাইয়া আবরণ মধ্যেই মরিয়া যায়, তন্নিবন্ধন দুর্গন্ধ বাহির হয়। ঈদৃশ বীজকে মরা বীজ কহে। মরা বীজে চারা জন্মে না। বোতল বা শিশি মধ্যে অতিশয় পূর্ণ করিয়া বীজ রক্ষিত হইলে তাহাতেও ছাতা ধরে। যদিও শিশি বা বোতল মধ্যে ঠাণ্ডা লাগিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না তথাপি প্রাকৃতিক আকর্ষণ হেতু বীজান্তর্গত রস বাষ্পাকারে উপরে উঠিবার প্রয়াস পায় কিন্তু বহির্গত হইতে না পারিয়া তন্মধ্যে সঞ্চিত হয়, ফলতঃ বীজে ছাতা ধরে, বীজ পচিয়া যায়। সামান্য গন্ধদুষ্ট হইলেই জানিতে হইবে যে, সে বীজ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতঃপর বীজকে আলোকে না রাখিয়া অন্ধকারে রাখা কর্ত্তব্য। বীজ মধ্যে রস থাকে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

এতদবস্থায় রস, উত্তাপ বা আলোক পাইলেই বীজগণ সঞ্জীবিত হইয়া উঠে, অথচ অঙ্কুরিত হইতে না পারিয়া পূর্ব্ববৎ নষ্ট হইয়া যায়। শুষ্ক গৃহে, শুষ্ক আধারে আবরিত করিয়া বীজ রক্ষা করিতে হয় এবং আবশ্যকমত বাহির করিয়া লইতে হয়। এই-রূপে অনেক দিন এমন ৫।৭ কি ১০ বৎসর উত্তম অবস্থায় বীজ রক্ষা করিতে পারা যায়। উল্লিখিত প্রণালীতে গ্রন্থকার ক্ষুদ্র ও সুকুমার কপি, তামাক, বার্ত্তাকু প্রভৃতি বিবিধ তরকারীর বীজ ৭।৮ বৎসর রক্ষা করিতেন। প্রতি বৎসরই যে উৎকৃষ্ট ফসল উপৎন্ন হইবে, এরূপ আশা করা যায় না, কারণ অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, তুষারপাত প্রভৃতি নানা কারণে ফসল নষ্ট হইতে পারে, এজন্য যে বৎসর উৎকৃষ্ট ফসল জন্মিবে সেই বৎসর সমূহ পরিমাণে বীজ সংগ্রহ করিয়া রাখিলে পর বৎসর ভাল বীজ না জন্মিলে বা না পাওয়া গেলেও সেই পুরাতন বীজে কার্য্য চলিতে পারে। বীজ রক্ষার ইহা একটী গুহ্য নিয়ম।*

সারের অন্তর্গত উদ্ভিদ-খাদ্যের অনুপাতানুসারে তাহার মূল্যের ইতর বিশেষ হয় ইহা সকলে অবগত নহেন। আবার ইহাও কেহ লক্ষ্য করেন না যে, মূল্যের তারতম্যে সার ভাল বা মন্দ হইতে পারে। একটী দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিলে সকলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। কোন খৈল হয়ত, মূল্যানুসারে, তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, সুতরাং মূল্যও বিভিন্ন। যে খৈলের মূল্য দুই টাকা, তাহা যে তিন টাকা মূল্যের খৈল অপেক্ষা নিকৃষ্ট বালকেও বুঝে অথচ আমরা অল্প মূল্যের খৈল ক্রয় করি। খৈল মধ্যে নাইট্রোজেন থাকে বলিয়া প্রধানতঃ উহা ব্যবহৃত

* মৎকৃত "কৃষিক্ষেত্র" (৫ম সংস্করণ) দ্বাদশ অধ্যায় দেখুন।

হয় কিন্তু কোন্ খৈল মধ্যে কত অংশ নাইট্রোজেন বিদ্যমান তাহা আমরা বিচার করি না, কেবল মূল্যের অল্পতার প্রতি লক্ষ্য করি। কোন খৈল মধ্যে শতকরা দুই ভাগ, আবার কোন খৈল মধ্যে শতকরা সাত ভাগও নাইট্রোজেন থাকিতে দেখা যায়। ইহা বড় সামান্য প্রভেদ নহে! শতকরা চারি ভাগ নাইট্রোজেন! বিশিষ্ট-খৈল প্রদান করিলে প্রতি মণ খৈল হইতে /১৶ (উনিশ ছটাক) নাইট্রোজেন পাওয়া যায়, আর ছয়-ভাগ-বিশিষ্ট খৈল ব্যবহারে /১৫১০ (সাড়ে আটাশ ছটাক) নাইট্রোজেন পাওয়া যায়, কিন্তু শেষোক্ত পরিমাণ নাইট্রোজেন সঞ্চয় করিতে হইলে প্রথমোক্ত খৈলের দেড়মণ প্রয়োজন কিন্তু এই দেড়মণের মূল্য শেষোক্ত এক মণ খৈলের অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে কিম্বা তাহা না হইলেও বহনী খরচা অধিক লাগে তাহাও বিবেচনার বিষয়। একশত মণ সামগ্রীর বহনী খরচ যত, দেড়শত মণ বহন করিতে তাহার দেড়গুণ লাগিবে ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে উৎকৃষ্ট সার ব্যবহার করায় সমধিক লাভ থাকে। এইজন্য উৎকৃষ্ট সার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।*

* মৎকৃত 'উদ্ভিদ খাদ্য' নামক পুস্তকে সার সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞাতব্য তথ্য আলোচিত হইয়াছে।

সমাপ্ত।



পরিশিষ্ট।



লেখা-পড়া এবং পুস্তক-পত্রিকা প্রভৃতি দ্বারা যে কৃষিকার্য্য হয় তাহা শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের জন্য। আমাদিগের কৃষককুল মধ্যে আজও শিক্ষা-বিস্তার হয় নাই যে, তাহারা পুস্তকাদি পাঠ দ্বারা বিশিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিয়া কৃষিকার্য্য করিতে পারে, কিন্তু সেই কৃষককুলই আমাদিগের ভরসাস্থল। তাহারা হাল ছাড়িয়া দিলে আমাদিগের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না, অথচ তাহারাই সমাজে, ঘৃণ্য না হউক, নিতান্ত নগণ্যভাবে থাকিয়া দারিদ্রের কঠোর তাড়নায় নিরন্তর জরজর। অসম্পূর্ণ আহার, জঘন্য গৃহে বাস, মলিন ও জীর্ণ বস্ত্র পরিধান প্রভৃতি অপরিহার্য্য কারণে নানারোগে প্রতি বৎসর কত কুটীরবাসী কৃষক ও শ্রমজীবী অকালে মানবলীলা সম্বরণ করিতেছে! দারিদ্র দূর না হইলে তাহাদিগের আর সুরাহা দেখা যায় না। কিন্তু তাহার প্রতিকারের কোন উপায় হইতেছে না! কেবলই যে কৃষককুলের দিন দিন কষ্ট বৃদ্ধি হইতেছে তাহা নহে, অধস্তন মধ্যবিত্ত শ্রেণী মধ্যে যে সে কষ্ট প্রবেশ করিয়াছে, তাহা বেস দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। যত দিন যাইতেছে, ততই পাশ্চাত্য শিক্ষাসভ্যতা, সুখসচ্ছন্দতা বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু লোকের আয় বাড়িতেছে কৈ? প্রতি বৎসর সেভিং ব্যাঙ্কে বহু টাকা জমা হইতেছে দেখিয়া রাজ-পুরুষগণ মনে করেন যে, দেশের ধন-বৃদ্ধি হইতেছে। প্রতি বৎসর রাশি রাশি স্বর্ণ-মুদ্রা ভারতবাসী গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে দেখিয়া তাঁহারা আরও ভাবিতেছেন যে, সাধারণ ভারতবাসী

তৎসমুদায়কে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছে কিম্বা তদ্দ্বারা অলঙ্কার গড়াইতেছে। সেভিং ব্যাঙ্কে টাকা সঞ্চয় কিম্বা সুবর্ণ মুদ্রা গ্রাস—এতদুভয়ই ঠিক কথা, কিন্তু কোন শ্রেণীর মধ্যে তাহা হইতেছে সে কথা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি সহরের কথা বারেক ভুলিয়া গিয়া পল্লীগ্রামের বাড়ী বাড়ী সংবাদ লও দেখি। যাও দেখি ঐ কুটীরবাসী শ্রমজীবী বা কারিগর বাড়ী, যাও দেখি দরিদ্র কৃষকের অর্দ্ধ-শায়িত তৃণহীন কুটীর দ্বারে, তখন বুঝিবে দেশের প্রকৃত দশা কি? শান্ত অদৃষ্টবাদী ভারতবাসী দুঃখ কষ্টের পেষণে মরণোন্মুখ, তথাপি মুখ ফুটিয়া বলিতে জানে না, রাজার দ্বারে গিয়া আবেদন করিতে জানে না। তাহারা কেবল জানে 'বিপত্তে শ্রীমধুসূদন,' এবং এই জন্য অনাহারে মরিলেও পাশ্চাত্য সাধারণ শ্রম-জীবীগণের মত দেশব্যাপী ধর্ম্মঘট করিতে পারে না, খুন জখম দ্বারা রাজপথ শোণিতপ্লাবিত করিতে জানে না, রাজপুরুষ-দিগকে বিভিষিকা প্রদর্শন করিতেও জানে না—তাহারা ভগবানের দোহাই দিয়া পড়িয়া থাকিতে জানে। পাশ্চাত্যের সহিত ভারতবাসীর কত প্রভেদ,—আকাশ পাতাল!

শিক্ষিত ভারতবাসীকে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইবে। কেবল তাহাই নহে, প্রত্যেক কর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তিকে বিদ্যা, বুদ্ধি ও অর্থের সামর্থ্যানুসারে উপার্জ্জন করিতে হইবে, পূর্ব্ববৎ একজনের উপার্জ্জনের উপর সমগ্র পরিবার নির্ভর করিলে এক্ষণে আর চলে না। অধিকাংশ পরিবার মধ্যেই দেখা যায়, এক ব্যক্তি উপার্জ্জন করে আর অপর সকলে তাঁহার অন্ন ধ্বংশ করেন। স্ত্রীলোক, বালকবালিকার কিম্বা বিদ্যার্থীর কথা বলি না, কিন্তু সক্ষম

নিষ্কর্ম্মা পুরুষগণ কেন না উপার্জ্জন করে? অধুনা তাহা হয় না বলিয়া ক্রমে একান্নবর্ত্তী সংসার সকল ভাঙ্গিয়া গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃস্থ পরিবারের সংখ্যা বাড়িতেছে এবং সামান্য বিপৎপাত হইলেই ইহাদিগকে দারিদ্রের গভীর জলে নিমজ্জিত হইয়া হাবুডুবু খাইতে হয় এবং উপার্জ্জনকারীর মৃত্যু সংঘটিত হইতে না হইতে স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণ বিপদের অকূল সাগরে ভাসিতে থাকে। ইহা নিত্য ঘটনা। ইহার উপর বিবাহ জ্বালা। পূর্ব্বে ধনী নির্ধন সকল সংসারেই বিবাহ একটা সুখের জিনিষ ছিল কিন্তু এক্ষণে নির্ধনের ঘরে বিবাহে,—কি বর পক্ষে, কি কন্যা পক্ষে—সর্ব্বস্থলে বিবাহ ফল বড় দুঃখময় হইয়া পড়িয়াছে। পাত্রের অভিভাবক নিজ অবস্থার কথা বিস্মৃত হইয়া, পাত্রের ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া, তাহার বিবাহ দেন, অল্প দিনের মধ্যে সন্তান সন্ততি ভূমিষ্ঠ হইতে থাকে। যথেষ্ট উপার্জ্জনাভাবে সেই সকল আদরের সামগ্রীগুলি কষ্ট পাইতে থাকে। এতদ্দ্বারা সাংসারিক দারিদ্রতা বৃদ্ধি পায়, ব্যক্তিগত উৎসাহ-উদ্যম চিরদিনের জন্য তিরোহিত হয়। অতঃপর কন্যার অভিভাবকগণ যথাসর্ব্বস্ব দিয়া কন্যার বিবাহ দেন, কারণ উপায়ান্তর নাই। অতঃপর অবশিষ্ট সন্তান সন্ততির ভালরূপ ভরণপোষণ বা লেখাপড়া হয় না। এই সকল কারণে সমাজের দিন দিন দারিদ্র বাড়িতেছে। সামাজিক কথা আলোচনা করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু গৃহস্থালী সুখসচ্ছন্দের সহিত ইহা এত ঘনিষ্ট যে তাহার উল্লেখ অনিবার্য্য।

যাহা হউক, আমরা শিক্ষিত মধ্যবিত্তদিগকে কৃষি বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে অনুরোধ করি। যাঁহার যেরূপ শক্তি তিনি সেই মত কার্য্যের অবতারণা করুন। শ্রম করিলে বিফল

মনোরথ হইতে হয় না। পল্লীগ্রামবাসীদিগের মধ্যে প্রায় সকলেরই অল্পাধিক জমি-জমা আছে, কিম্বা বাসস্থানের সংলগ্ন কতকটা জমিতে বাগান ও পুষ্করিণী থাকে কিন্তু যথাযোগ্য পরিচর্য্যাভাবে সে সকল বাগান প্রায় পরিত্যক্ত অরণ্যবৎ অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। পুষ্করিণীগুলি পানা, সেওলা ও আগাছায় পূর্ণ। এতদ্দ্বারা গৃহস্থের বিশেষ কোন উপকার দর্শে না। কখনও এক কাঁদী কদলী, দুই দশটা নারিকেল বা ২০।৫০টী আম্র, কাঁটাল ইহাই পাওয়া যায়। সেই সমুদায় আওলাতের পাট-তদ্বির হইলে সমধিক ফল প্রদান হইতে পারে কিন্তু তাহা করে কে? অনেক গাছপালা আদৌ ফল প্রদান করে না, অথচ স্থান অধিকার করিয়া রৌদ্র বায়ুর পথ রুদ্ধ করিয়া ম্যালেরিয়া ও মশকাদির রঙ্গালয় হইয়া আছে। এই সকল জঙ্গল নির্ম্মূলিত হইলে স্থানীয় স্বাস্থ্য অনেক উন্নত হয়। তাহা ব্যতীত সেই সকল আপাতপতিত জমি পারিবারিক বাগানে পরিণত হইলে গৃহস্থের বিশেষ উপকার দর্শে। প্রতি দিন সংসারের খরচের জন্য তরিতরকারী উৎপন্ন করিতে পারিলেও সামান্য লাভের কথা নহে। আর যাঁহারা ঈষৎ অধিক জমি লইয়া কৃষিকার্য্য করিতে পারেন তাঁহাদিগের পক্ষে আরও সুখের বিষয় হয় কিন্তু এতদর্থে ব্যক্তি বিশেষকে স্বতন্ত্রভাবে সমুদায় সাজসরঞ্জাম একত্র করিয়া কাজ করিতে অনেক খরচ পড়িয়া যায়। এই নিমিত্ত প্রায় ১৫।১৬ বৎসর কি ততোধিক কাল গত হইল জেলায় জেলায় প্রতি ১০।১৫ খানি গ্রামের মধ্যস্থলে এক একটী পল্লীভাণ্ডার সংস্থাপন করিবার জন্য গ্রন্থকার প্রস্তাব করেন। উক্ত প্রবন্ধ 'রামকৃষ্ণ মিশনের' মুখ পত্র "উদ্বোধন" নামক মাসিক

পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহার দুই এক বৎসর মধ্যে গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত "কো-অপারেটিভ্ ক্রেডিট্" সোসাইটীর সৃষ্টি হয়। উক্ত সোসাইটী হইতে গ্রাম্য কৃষক ও শ্রমজীবীগণকে কৃষি ও তদানুসঙ্গিক শিল্প প্রভৃতির সাহায্যার্থ অল্প হারে টাকা কর্জ্জ দেওয়া হইয়া থাকে। পল্লীভাণ্ডারের উদ্দেশ্য ছিল—স্থানীয় ভদ্র ইতর সকলে উহাতে টাকা জমা রাখিবে এবং সে জন্য নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ পাইবে। সেই টাকা আবার স্থানীয় কৃষক ও কারিগর-দিগকে অল্প হারে টাকা কর্জ্জ দিবে। এই দুই বিষয়ে ক্রেডিট্ সোসাইটী ও পল্লীভাণ্ডার এক মত। অতঃপর পল্লীভাণ্ডারের অপর প্রস্তাব—আড়ৎদারী প্রণালীতে (ফসল সংগ্রহ হইবামাত্র) কৃষকগণ সমগ্র বা ইচ্ছামত ফসল সেইখানে জমা দিয়া আপাততঃ নিজ নিজ খরচের জন্য কিছু টাকা লইবে। পল্লী-ভাণ্ডার বাজারের অবস্থা বুঝিয়া শীঘ্র বা বিলম্বে সেই মাল বিক্রয় করিয়া কৃষকের বাকী পাওনা কৃষককে চুক্তি করিয়া দিবে এবং আড়ৎদারী হিসাবে কিছু টাকা ভাণ্ডারের তহবিলের জন্য দিবে। এতদ্ব্যতীত, ভাণ্ডার নানাবিধ সার, উৎকৃষ্ট হাল-বলদ ও যন্ত্রাদি সর্ব্বদা মজুত রাখিবেন। স্থানীয় অধিবাসীগণের প্রয়োজন হইলে ঐ সকল জিনিষ সময়ে সময়ে তাহাদিগকে কর্জ্জ দিবেন এবং তাহার ভাড়া হিসাবে কিছু আদায় করিবেন। উক্ত আদায় তখনই কৃষক দিতে না পারিলে ক্ষতি নাই, পরবর্ত্তী ফসল-কালে আদায় দিতে পারে। এইরূপ ক্ষুদ্র-বৃহৎ অনেক কাজ পল্লীগ্রামে বসিয়া স্বাধীনভাবে করিতে পারা যায়। কো-অপারেটিভ সোসাইটী হইতে কেবল টাকা কর্জ্জ দেওয়া হয় কিন্তু পল্লীভাণ্ডার মতে কাজ করিলে অনেকেই উৎকৃষ্ট

কাজ করিতে পারে। কেবল টাকাতে হয় না। সুদূর পল্লীগ্রামে খৈলাদি সার বা ভাল বীজ বা কোন বিশিষ্ট যন্ত্র পাওয়া দুষ্কর আর প্রত্যেকের পক্ষে সকল সরঞ্জাম সংগ্রহ করা দুঃসহ, কিন্তু উল্লিখিত পদ্ধতিতে কাজ করিলে, সকল জিনিষ সহজে পাওয়া যায় অথচ উভয় পক্ষে বেশ লাভের কারবার চলিতে পারে। এই উপায় অবলম্বন না করিলে প্রকৃতপক্ষে কৃষির কিছু হইবে না—ইহাই আমার বিশ্বাস।

—•—